নতুন ভোর

বাতায়ন

প্রভু আমার

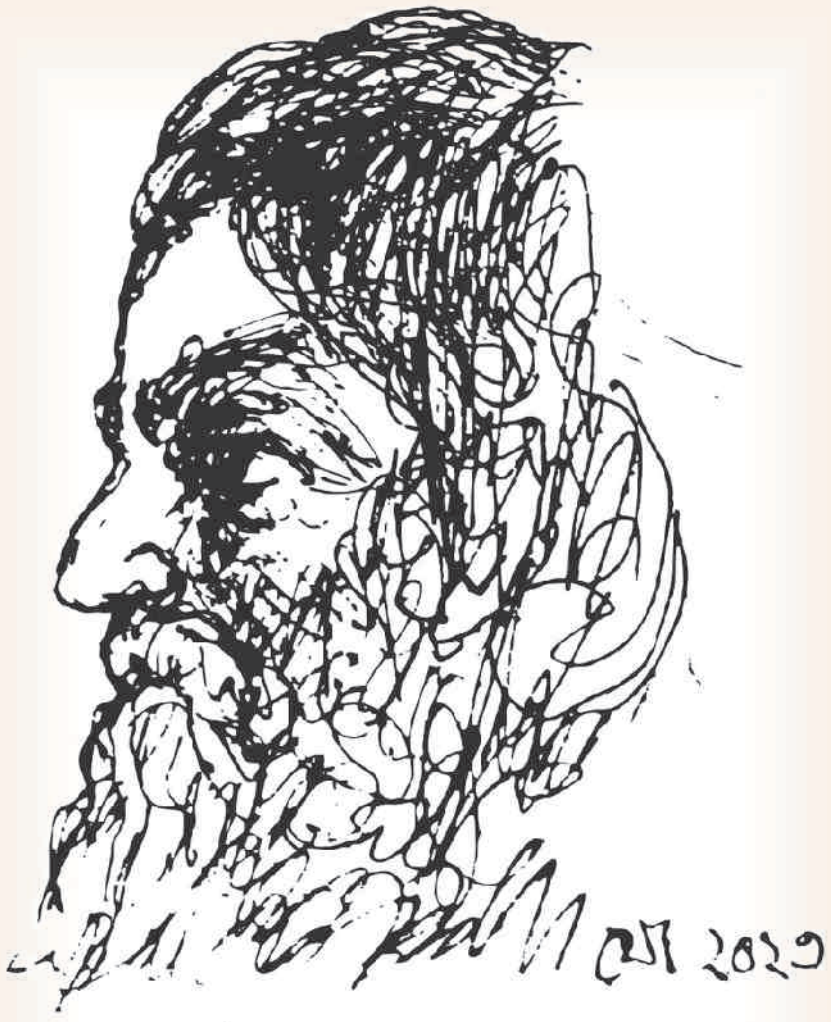

বাতায়ন

সম্পাদনা

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

তন্ময় চক্রবর্তী (আমন্ত্রিত)

Batayan

সম্পাদিকা ঃ রঞ্জিতা চ্যাটার্জী

Volume 32 | January, 2024

A literary magazine with an International reach

বাতায়ন

Issue Number 32 : January, 2024

Editor
Ranjita Chattopadhyay, IL, USA

Sub Editor
Sugandha Pramanik
Sydney, Australia

Design & Art Layout
Kajal & Subrata, Kolkata, India

Website Support
Susanta Nandi, India

Chief Editor & CEO
Anusri Banerjee
Perth, Western Australia
a_banerjee@iinet.net.au

Published By
BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registration No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Photo Credit

Supratik Mukherjee — **Front Cover**

**"ফুলে ফুলে শুঁড়ি আহারী,
চরিত্তির রঙ্গিল বাহারী।"**

সুপ্রতীক মুখার্জী। পার্থিব বাসিন্দা। প্রজ্ঞা-পিয়াসি।

Suranjana Chattopadhyay, IL, US — **Title Page**

Suranjana Chattopadhyay – Studies Law at UT Austin. Loves to read, travel and spend time with friends and family.

Soumen Chattopadhyay — **Back Cover**

লেস ভোগেস, ফ্রান্স – এই জানালা দিয়ে বাহিরে স্কয়ারটির দিকে তাকিয়ে থাকেন বিশ্ববন্দিত ফ্রাঁসিস ঔপন্যাসিক ভিক্টর হুগো। তাঁর বিখ্যাত সৃষ্টি লা মিসেরাবলে এর অনেকটা অংশ লেখা হয়েছিল এখানে থাকাকালিন।

Saumen is an avid outdoor enthusiast and enjoys hiking, trekking, and photography. He also takes part in recitation, drama, mind science. Saumen is an entrepreneur in the field of investment research and portfolio management. He lives in Chicago.

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ। রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

এইসবে একটি নতুন বছর শুরু হয়েছে। বছর শেষ আর শুরুর এই খেলা কিন্তু অনেককাল ধরে চলে আসছে। সময়ের পালাবদল নতুন কোন বিষয় নয়। তাও প্রতিবারই ক্যালেণ্ডারের পাতায় ৩১শে ডিসেম্বর এর সূর্যাস্ত আর ১লা জানুয়ারীর সূর্য ওঠার মধ্যের সময়টুকু জুড়ে চলে আমাদের উত্তেজনা। নতুন আশা, নতুন উদ্দীপনা। চলে নিজেদের নবীকরণের নানা চিন্তাভাবনা। আর এরই পাশাপাশি ফেলে আসা দিনগুলোর দিকে ফিরে দেখা। ২০২৩ "বাতায়ন" পত্রিকার ইতিহাসে ছিল একটা উল্লেখযোগ্য বছর। অন্যান্য বছরের তুলনায় আমাদের বৈদ্যুতিন সংখ্যা কিছু কমই প্রকাশিত হয়েছে গত বছর। ওয়েবসাইটে আমাদের উপস্থিতি তেমন জোরালো না হলেও বেশ কিছু বিশেষ কাজ হয়েছে।

গতবছর বইমেলায় "বাতায়ন" এর স্টল ছিল। সেখানে দেশ বিদেশের অনেক লেখকের চেনাজানা হয়েছে। হয়েছে ভাব ও ভাবনার আদানপ্রদান। বিশ্বের নানাজায়গার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চাকারীদের মধ্যে সেতুবন্ধনের যে লক্ষ্য "বাতায়ন" এর ছিল, ২০২৩ এর বইমেলা ছিল সেই লক্ষ্যপূরণের পথে এক বড় পদক্ষেপ।

বইমেলা উপলক্ষ্যে "বাতায়ন" প্রকাশনার থেকে বেরিয়েছে দুটি বই – রমা জোয়ারদারের "চাঘর" আর সঞ্জয় চক্রবর্তীর "ধুলো রঙের বিকেল"।

সিডনি শহরে আয়োজিত হয়েছে এক বিশেষ অনুষ্ঠান – "তিন ভুবনের পারে"। আমন্ত্রিত কবিদের মধ্যে ছিলেন শ্রীজাত ও দূর্বা, তন্ময় চক্রবর্তী। সিডনির স্থানীয় সাহিত্যপ্রেমী ও কবিদের মধ্যে কাব্য আলোচনার একটা সুন্দর জায়গা তৈরী করে দিতে পেরেছে বাতায়ন। গতবছর এর ২৯শে জুলাই "ভিভানতা" হোটেলে গুণীজনদের ব্যক্তিত্বের আলোয় বিভাময় পরিবেশে প্রকাশিত হয়েছে বাতায়নের রবীন্দ্র সংকলন "প্রভু আমার"। প্রকাশসন্ধ্যার অনুষ্ঠানটি ছিল সংক্ষিপ্ত ও সুচারু। বাইশে শ্রাবণের কিছুদিন আগে "প্রভু আমার" এর প্রকাশ লেখক ও পাঠকদের কাছে হয়ে উঠেছিল তাৎপর্য্যময়। এই বই "বাতায়ন" প্রকাশনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মূল সুরটি হল সমন্বয় ও সংযোগের। সে সুর রবীন্দ্র আদর্শে বিশেষভাবে প্রভাবিত। কবিগুরুর প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা ও ভালবাসার জায়গা থেকেই জন্ম হয় বাতায়নের বৈদ্যুতিন রবীন্দ্রসংখ্যা "বৈশাখী"র।

বৈশাখীর প্রথম প্রকাশ ২০১৮ র মে মাসে। ২০১৮ থেকে ২০২৩-বিগত পাঁচ বছর ধরে বৈশাখী প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বাতায়ন বন্ধুদের নিজের রবীন্দ্রনাথ ধরা আছে বৈশাখী সংখ্যার লেখাগুলিতে। রবীন্দ্রপ্রতিভা, জীবন বা কাজের কোন বিশেষ মূল্যায়ন কিংবা বিশ্লেষণ নয়, – বাতায়নের রবীন্দ্রতর্পন শ্রদ্ধা ও ব্যক্তিগত অনুভূতির জায়গা থেকে আহরিত।

বিভিন্ন বছরের "বৈশাখী" সংখ্যায় প্রকাশিত কিছু লেখা ও বেশ কিছু নতুন রচনায় সমৃদ্ধ "প্রভু আমার"। পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বাঙালীদের একসূত্রে বাঁধার প্রয়াসের এক উজ্জ্বল উদাহরণ এই রবীন্দ্রবিষয়ক রচনার সংকলন। ২০২৩ এর সেপ্টেম্বর এ বাতায়ন আয়োজন করেছে এক কবিতা কর্মশালার। সাম্প্রতিককালের স্বনামধন্য কবি শ্রীজাত এই কর্মশালা পরিচালনা করেন। কর্মশালার বিপুল জনপ্রিয়তার কারণে ভবিষ্যতেও এই ধরণের কর্মশালার আয়োজন করার চিন্তাভাবনা চলছে। পিছনে তাকিয়ে দেখা যাচ্ছে বিগত বছরে বাতায়নের চলার পথ ছিল বর্ণময়। আগামীদিনগুলিও সম্ভাবনায় ভরপুর। নতুন কাজ। ইচ্ছে আছে আরও নানাবিধ সৃষ্টিশীল উদ্যোগ রূপায়িত করার। তবে সেসব প্রয়াসের সর্বাঙ্গীন সাফল্যের জন্যে বন্ধুদের ভালবাসা আর শুভেচ্ছা হল পাথেয়। গত সাত বছরে বাতায়নের কর্মকাণ্ড প্রসারিত হয়েছে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর কিছু বৈদ্যুতিন সাহিত্য সংখ্যা প্রকাশ করার মধ্যেই আর সীমাবদ্ধ নেই তার ক্রিয়াকলাপ। বেড়েছে বাতায়নের বন্ধু পরিবার। দেশবিদেশের বাংলা ও বাঙালী ভালবেসে যে সাহিত্যসাধনা করে

চলেছেন তার একটা অর্থপূর্ণ দলিল তৈরী করে চলেছে "বাতায়ন"। ভবিষ্যতেও সেই প্রচেষ্টা চলবে। বাতায়ন বন্ধুদের জন্যে পাশে থাকার অনুরোধ রইল।

২০২৪ এর প্রথম বৈদ্যুতিন সংখ্যা "নতুন ভোর" প্রকাশিত হল। এই সংখ্যার প্রায় প্রতিটি লেখাই এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ। শ্রদ্ধা ও স্মরণ, কবিতা, ভ্রমণ, গল্প – নানাস্বাদের নানা রচনায় সমৃদ্ধ এই সংখ্যাটি পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। পত্রিকার পক্ষ থেকে নতুন বছরের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

২০২৪ দীপ্তিময় হোক সকলের জীবনে।

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক, বাতায়ন পত্রিকা গোষ্ঠী

:: কবিতা ::

তসলিমা নাসরিন	**মৃত্যুহীন মেয়ে**	১২
ইন্দিরা চন্দ	**মৃত্যুযাপন**	১৩
শুভ্র দাস	**অসুখ**	১৪
	ছায়ার ছবি	১৪
তাপস কুমার রায়	**বিস্মরণ**	১৫
পঞ্চতপা দে সরকার	**আজ একটা তুমি দিন হোক**	১৬
অভীক রায়	**তারিখ**	১৭
সুগত খাসনবিশ	**এক যাযাবর**	১৮
তমঘ্ন গোস্বামী	**পেন্ডুলাম**	১৯
ব্রতী ভট্টাচার্য	**অলীক**	২০
রুদ্রশংকর	**কেমন আছো, মারুফা ...**	২১

:: গল্প ::

শমীতা দাশ দাশগুপ্ত	**পুতুলখেলা**	২২
সুমিতা বসু	**জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ**	২৮
রমা সিনহা বড়াল	**সৌরমন্ডলের কথা**	৩৩
দেবব্রত তরফদার	**ব্যতিক্রমী**	৩৭
কাজী লাবণ্য	**ধূসর জোছনা**	৪৪
পৌষালী ঘোষ	**হলুদ গোলাপ**	৪৯
মিতা বোস	**ফেলে আসা দিনের কথা**	৫২

:: অনুগল্প ::

হুমায়ূন কবির	**গন্তব্য**	৫৫

:: শ্রদ্ধা ও স্মরণ ::

রূপা মজুমদার	**নারায়ণ সান্যাল – একাই একটা ইন্ডাস্ট্রি**	৫৭
ফারুক ফয়সল	**রথ হয়ে, জয় হয়ে, চিরন্তন কাব্য হয়ে এসো**	৬০
অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়	(*মেজদার হোটেল*) **কমলকুমার মজুমদার – এক ইউরোপীয় ব্রাহ্মণকে ফিরে দেখা**	৬৪

:: ভ্রমণ ::

স্বাগতা চট্টোপাধ্যায়	**গঙ্গোত্রীর যাত্রাপথে**	৬৮
অঞ্জন রায়	এ্যামাজনের জঙ্গলে ক'টা দিন	৮১

সিডনিতে
শ্রীজাত-র সাথে
কবিতা ওয়ার্কশপ

৩রা সেপ্টেম্বর, ২০২৩

প্রিয়া চক্রবর্তী – কাশফুল

দিনের ক্ষীণ আলো মেলে রাতের অন্ধকারে,
দূরে কোথাও নীরব স্মৃতি জ্বলছে নিভছে,
আমার স্বপ্ন এখন বিচ্ছেদের ব্যথা ছায়া,
কাশফুলের মাঝে আজও খুঁজে পাই
আলবাত খুবই আবছা।।

পৃথা ব্যানার্জী – আদর

আদর নামুক মাঝরাতে।
তুমুল ঝগড়ার পর,
দশ দিন মুখ দেখাদেখি বন্ধের পর
যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাব'র পর
সোনালী পানীয়ে অনেকটা গজল গুলে দেওয়ার পর,
সজোরে দরজা বন্ধ করে দেওয়ার পর,
আদর নামুক মাঝরাতে –
অজান্তে হাতে হাত ঠেকে যাওয়ার পর।

সৌমিক বাসু – সঙ্গে শ্রীজাত

গালভরা নাম,
কবিতার এক "কর্মশালা"
আসলেতে আড্ডা মারার এক অছিলা
হাতছানি দেয় যেই বাতায়ন,
সাগরপাড়ে তাই আগমন
একটু ছড়া, একটু ছবি
খানিক বন্ধু, খানিক কবি
লেখার সাথে মনটি খোলা,
সিডনিবাসীর ভরলো ঝোলা
আসলে পরে যেতেই হবে,
মনটা বলে আবার কবে ?

পৃথা ব্যানার্জী – কবি আসছেন তোমার শহরে

কবি আসছেন তোমার শহরে
কর্পোরেটের ইঁট কাঠ পাথরের যে শহর, তোমাকে শিখিয়েছে মর্টগেজের হিসাব
সেই শহরে পুরোনো বইয়ের গন্ধ নিয়ে কবির আবির্ভাব ।
অপেরা হাউসের সিঁড়ি বেয়ে কবি হাঁটবেন, পিছনে বাজবে ফিফথ্ সিম্ফনি
কবির পাঞ্জাবী থেকে ঝরবে একটা দুটো মুক্ত শব্দ, যা তুমি কক্ষনো শোনোনি ।
তুমি কবিকে ভাববে অতি মানুষ ভাববে শুধুই মুক্ত চিন্তা
তুমি নিজ বোধ সীমিত করে চাইবে কবি জয় করে নিক দিনটা ।
কবির ছায়া দীর্ঘ হবে, কোথাও গাঢ় কোথাও বা আবছা হবে
তোমার সাথে দেখা হবে, সত্যি বলছ দেখা হবে ?
ধোয়াচ্ছ মুখ পানীয় রঙ শব্দ অনেক কথা অল্প
অনেক কিছু শুনতে চাওয়া অনেক কিছু বলব বলব ।
হাই ওয়ে ধরে ফিরছ বাড়ি স্টেয়ারিং-এ একলা বসে
কবি কোথায় ? কবি কোথায় ? গাড়ি ছুটছে ১১০ এ ।
শুনলাম নাকি কবি আসছেন তোমার শহরে
এবারে কিন্তু আমায় ঠিক জানিও মনে করে ।

পারিজাত ব্যানার্জী – ধারাপাত

মাঝে মাঝে বড্ড কান্না পায় আমার।
সব সময় নয় যদিও;
আষাঢ় মাসে।

সেই যখন বিদগ্ধ দিন শেষে প্রথম
একটু একটু করে বাষ্প জড়ো হয়
আকাশের কোল আলো করে ...
সন্দিহান মেঘেদের গর্ভসঞ্চারণ করানোর অছিলায়;
অথচ নামব নামব করেও
প্রকৃতির কোল ভরিয়ে
নামার স্বাদ আহরণ করার ক্ষমতা পর্যন্ত ধরে না;
ঠিক তখন ...
সেই ব্রাহ্ম মুহূর্তে কান্না পায় আমার।
কি জানি,
হয়তো বা ভবিতব্যের দোষেই!

তাই তো চুপিচুপি
লিখে রাখি চেতনায়
অন্যের জবানীর কোনও
না বলা অস্ফুট স্বরে –
বর্ষা আমার বুকে রক্ত জমে থাকা
কালো ছোপটার পিতা।
আর দিনশেষে
সেই-ই হবে আমার গর্ভপাতের যন্ত্রণাও অঝোর ধারাপাতের দাপটে!

সুমিতাভ সাহা

বোধনসূত্র

নিখিল আর মৌলির বৈবাহিক সম্পর্কের বয়স এখন এক বছর পেরিয়ে আরও কয়েক মাস। গতবছর ফাল্গুনে গাঁটছড়া বেঁধেছিল তারা। কিন্তু তার পরপরই নিখিলকে একটা ছ'মাসের প্রজেক্টে আয়ারল্যান্ড এর ডাবলিনে চলে যেতে হয়। ফেরে ঠিক দুর্গাপুজোর পরপর। অর্থাৎ আজ থেকে ঠিক এক বছর আগে। সে হিসাবে এ শরৎকালই তাদের একসাথে ঘর করার প্রকৃত বার্ষিকী।

সদ্য শৈশব পেরনো তাদের এই সম্পর্কে এর মধ্যেই যদিও ঢুকে পড়েছে ক্লান্ত একঘেয়ে, বৈচিত্রহীন গোলকের প্যাঁচ। দোষ এখানে একজনেরই – একসঙ্গে কাটানো সময়ের অভাবের। নিখিল কাজ করে মাল্টিন্যাশনাল এক আইটি কোম্পানির উঁচু পদে। আর মৌলি এক নামজাদা রিয়াল এস্টেট কোম্পানির আর্কিটেক্ট। দুজনেরই কাজের তাই অস্বাভাবিক ব্যস্ততা – মন্থলি টার্গেটস্, ডেডলাইন, ক্লায়েন্ট কলস, মিটিংস্ ... এ সব নিয়েই কেটে যায় প্রতি দিন, সপ্তাহ, মাস। বাড়ি ফিরে সামান্য সুখ দুঃখের কথা বলা তো দূরের ব্যাপার; চোখ মেলে একে অপরকে প্রাণভরে দেখাও হয়ে ওঠেনা আর তাদের। কিভাবে যে আস্ত একটা বছর ঘুরে গেল টেরই পায়না তাই দুটিতে।

অথচ যখন একে অপরের থেকে দূরে ছিল তারা বিয়ের পরের প্রথম ছ'ছটি মাস, তখন একে অপরকে সামান্য কয়েক মুহূর্তের জন্যেও ভিডিও কলের মাধ্যমেও কাছে পেতে কেমন উতলা হয়ে পড়ত তারা। মৌলি স্বপ্ন দেখত, নিখিল ফিরলেই তারা তাদের সব কাজ মুলতুবি রেখে হারিয়ে যাবে কোথাও – বহু দূরে। আর মফঃস্বলে তাদের পৈতৃক ভিটে ফেলে আসা নিখিলের মনে আশা জেগেছিল, আর সে অন্তত আস্ত একটা অপরিচিত শহরের বুকে একলা থাকবে না কিছুতেই।

অবশেষে দুজনেরই বহু আকাঙ্খিত সেই "উই টাইম" মিলল দুর্গাপুজোর এই কটা দিনের ছুটির অবসরে। মৌলির এক বান্ধবী কাকদ্বীপ অঞ্চলের মেয়ে। তাই যখন সে দুজনকেই আমন্ত্রণ জানালো তাদের গ্রামের আড়াইশো বছরেরও বেশি পুরনো রাজবাড়ির পুজো দেখতে আসার জন্য; এ সুযোগ তারা হাতছাড়া করলনা কিছুতেই।

ট্রেনে চড়ে মাত্র কয়েক ঘন্টার পথ। ষষ্ঠীর দিন বোধন মায়ের। তার আগের দিনই তাই দুপুর দুপুর রওনা হয়ে গেল নিখিল আর মৌলি। বান্ধবীর বাড়ি ঢুকতে ঢুকতে প্রায় সন্ধ্যা। গ্রামের দিকে হঠাৎই ঝুপ করে অন্ধকার নামে। কলকাতার পুজোর রোশনাই কলরব সেখানে অনুপস্থিত। তবু আকাশে বাতাসে কেমন যেন পুজো পুজো গন্ধ খেলে বেড়ায়। তার জন্য অবশ্য ঠিক কে যে দায়ী – কাশফুলের বন, শিউলি ফুলের মাদকতা নাকি রাজবাড়ির নাট মন্দিরের উঠোন থেকে ভেসে আসা হালকা ধুপ ধুনোর গন্ধ; আলাদা করে তা ঠাহর করে বলা মুশকিল! মৌলি পৌঁছেই একবার ঠাকুর দর্শন করতে যাবে বলে বায়না জুড়ল। বান্ধবী হেসেই খুন। প্রতিমা যদিও নাট মন্দিরেই তৈরি হয়, তবে বোধনের আগে সেখানে যে কেউ যায় না। প্রাণ প্রতিষ্ঠা না হলে যে মায়ের মূর্তিতে আসল রং ধরেনা!

ষষ্ঠীর দিন খুব ভোর ভোর তাই উঠে পড়ল দুজনেই। মৌলি স্নান সেরে একখানা হালকা গোলাপী রঙের নতুন পাটভাঙা জামদানি শাড়ি পরল। আর নিখিল গায়ে তুলে নিল তুঁতে রঙের পাঞ্জাবি। রোজকার গড়পরতা জীবনের থেকে এক ধাক্কায় যেন বহুদূরে পৌঁছে গেল তারা তাদের এই নতুন রূপে। সেই প্রথমদিককার মত সামান্য লাজুক মুখে একে অপরের হাত ধরে হাঁটা দিল তারা গ্রামের মেঠো পথ পেরিয়ে ঠাকুরদালানের উদ্দেশ্যে।

রাজবাড়ির জাঁকজমক কালের নিয়মে আজ পড়তির দিকে। সেই রাজারাজরা নেই; নেই সুবিশাল ঝাড়বাতিও। তবুও একচালা প্রতিমার টানা টানা চোখের আবেশে এমন কিছু রয়েছে, যা সত্যিই ছাপিয়ে যায় সমস্ত বাহ্যিক চাকচিক্যকেই।

ইতিমধ্যেই পুজো শুরু হয়ে গেছে। পুরোহিত মশাই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করছেন মৃণ্ময়ী মূর্তির বুকে। ঢাকের শব্দে নেচে উঠেছে কচিকাঁচাদের ছোট্ট জমায়েত। গ্রামের বউ মেয়েরা উলু ধ্বনিতে ভরিয়ে তুলেছে চারপাশ। নিখিল আর মৌলি প্রাণভরে প্রণাম করল মাকে। তারপর তাকালো একে অপরের দিকে। আর অমনি ফাল্গুনের বিকেলের সেই কনে দেখা আলো কিভাবে যেন সময়ের সব হিসাব ওলটপালট করে হাজির হয়ে গেল শরতের সকালে, সকলের অগোচরে। ফিরে এলো গোধূলির রাঙা সেই মধুর শুভদৃষ্টির নব আস্বাদ তাদের মননে।

আর ঠিক এভাবেই দুর্গা ষষ্ঠীর বোধনের সেই পূণ্য লগ্নে আবার নতুন করে এক আত্মিক বাঁধনে জড়িয়ে পেঁচিয়ে পড়ল নিখিল মৌলি – ঘটে গেল অমোঘ আর এক নবসূচনার কলরব ভীষণই নীরবে।

তসলিমা নাসরিন

মৃত্যুহীন মেয়ে

ত্রিপোলির যে মেয়েটি বোরখা পরেনি বলে রাস্তায় মার খেলো
সে আমি,

ঢাকার যে মেয়েটি জার্সি পরে ফুটবল খেলেছে বলে হেনস্থা হলো,
সে আমি,

রিয়াদের যে মেয়েটি দেশের বাইরে একা যেতে চেয়েছিল বলে জেলে গেল,
সে আমি,

কাবুলের যে মেয়েটিকে প্রেম করার অপরাধে পাথর ছুঁড়ে মারা হলো
সে আমি।

দামেস্কের যে মেয়েটিকে পিটিয়ে হত্যা করলো তার স্বামী
সে আমি,

কায়রোর যে মেয়েটি বিয়েতে রাজি হয়নি বলে খুন হলো,
সে আমি,

মগাদিশুর যে মেয়েটি শান্তির জন্য পথে নেমেছিল বলে খুন হলো,
সে আমি,

তেহরানের যে মেয়েটি হিজাব পরেনি বলে খুন হলো
সে আমি।

ইন্দিরা চন্দ

মৃত্যুযাপন

নাম - না জানা
পথ - অচেনা
ঘর - অজানা
এই ঠিকানা

চিঠি পাঠালে
কালো বা নীলে
ধুয়ে গিয়ে জলে
"জানিও পৌঁছালে!"

সেই মেঘের দেশে
বৃষ্টি থামার শেষে
এলোকেশি কে সে ?
যাচ্ছে ভেসে ভেসে

ভাসবে না ডুববে ?
কে তাকে বলবে ?
কেমন করে জানবে ?
থামবে না চলবে ?

অতলে গভীরে
জলমগ্ন কলেবরে
শরীর আধারে
মনের নিবিড়ে

মৃত্যু যাপন
দিন রাত্রি ক্ষণ
অচলায়তন
কঠিন বন্ধন

পাতালে প্রবেশ
বৈদেহির অবশেষ
বাস্তব বিশেষ
পূরাণ কথার রেশ।

ইন্দিরা চন্দ — মেয়েবেলা কেটেছে মহারাষ্ট্র-র নাগপুরে। তারপর কোলকাতা। মনোবিদ্যা নিয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা করতে করতেই বিয়ে। তারপর কর্মসূত্রে রাজস্থান, গুজরাট, মুম্বাইতে থেকে ২০০১ সাল থেকে দেশের বাইরে। ওমান এবং সংযুক্ত আমিরশাহীতে বেশ কিছু বছর কাটিয়ে ২০০৮ সাল থেকে অস্ট্রেলিয়ার পার্থ-এ পাকাপাকি বাস। পেশায় হলেও নেশায় চিরকালই লেখালেখি। কবিতা, গান, নাটিকা, নাটক সব ক্ষেত্রেই নিজের প্রতিভার ছাপ রেখেছেন তিনি। পার্থ-এর বঙ্গরঙ্গ থিয়েটার গোষ্ঠী ওনার লেখা মঞ্চস্থ-ও করেছে। বহুদিন ধরে কলম ধরলেও তুলি ধরেছেন এই প্রথম। পুরোপুরি স্বশিক্ষিত শিল্পী। নাচ এবং গানে প্রশিক্ষণ থাকলেও আঁকা শেখেননি কোনোদিন। কিন্তু কবিতার বিষয়বস্তু এবং ছন্দের মতন ছবিগুলি রঙের ব্যবহার আর তুলির টান মন কাড়ে তার মননশীলতায়।

শুভ্র দাস

অসুখ

আয়না সামনে সকাল সকাল, থমকে দাঁড়ায় মন খারাপ
কপাল ভাঁজে বলির রেখা, সময় চলার গভীর ছাপ ।

শরীর এখন যন্ত্র কেবল, জমতে থাকা জং এর স্তর;
ক্লান্ত হৃদয়, শ্রান্ত মনে, অলস আঁখির অবশ স্বর ।

জগৎটারই আসল অসুখ, পুড়ছে জ্বরে তার কপাল,
এটাই কি সেই শেষের শুরু ? আসছে প্রলয়, ধ্বংস-কাল ?

আগুন কোথাও, জলের অভাব, কোথাও চলে খরার ত্রাস
বিলুপ্ত কেউ, ঘর ভেসেছে, ঝঞ্ঝা ঝড়ে জলোচ্ছাস।

তোমার আমার দুঃখবিলাস, তুচ্ছ সে সব চিন্তাভয়;
পৃথিবীটাকে বাঁচাও আগে, অন্য কথা পরেও হয়।

একদিন তো যেতেই হবে, রাস্তা না হয় খোলাই থাক,
আসা যাওয়ার পথের ধারে, নেবোই নাহয় আঁধার বাঁক।
প্রকৃতিটা বাঁচলে পরে, দেখবে যেসব নতুন মুখ,
বুক ভরা যে শ্বাসটি নেবে, সেটাই জেনো আসল সুখ।

ছায়ার ছবি

বৃষ্টি ভেজা সকাল শেষে রোদ ঝলমল দুপুর,
চোখ বুজলেই সেই কবেকার তক্তপোষে উপুড়।

দগ্ধ আকাশ, তপ্ত বায়ু, ভেজা কাপড় মেলা,
ঝুলতে থাকা তারের ওপর, চলতো ঝুলন খেলা।

খেলা ছিল লুকোচুরির, ছায়াই খেলা তখন,
সিক্ত কাপড় গা ছুঁয়ে কয় ঝাপসা মনের কাহন।

প্রেমিক-জামা ওই বাড়িতে, এ বারান্দায় শাড়ি,
আলো ছায়ার চোখাচোখি চলতো আড়াআড়ি।

পাঞ্জাবি আর সালোয়ারের ঘেঁষাঘেঁষি ভিড়ে ,
চাদর পরে হাত মিলেছে, নীরবে নিবিড়ে।

নৃত্য তালে নিত্য বসন, পর্দা ভেজা স্মৃতি,
ছেলেবেলা, মেয়েবেলা, শিশুবেলার ইতি।

আজকে যখন তপ্ত বাতাস, দমকা হাওয়া বয়,
সেই সেদিনের ছায়ার ছবি, ছায়াছবি হয়।

Shuvra Das is a Professor of Mechanical Engineering and lives in the greater Detroit area. He graduated from IIT Kharagpur in India and finished his PhD from Iowa State University. Photography, painting, writing, theater, and travel are some of his passions. Lately, he has been spending a lot of time in political activism.

তাপস কুমার রায়

বিস্মরণ

বিগত দিনের মতো মেঘ জমে
আর আমি শুয়ে থাকি
বিকেলের অনড় আকাশের নিচে

হাওয়ারা যে যার মতো শিস দেয়
হলুদ ধানের শীষে
অথবা সাপের নিঃশ্বাস বুঝি
কানের অনির্দিষ্ট পাশে

দূরে কোথাও মাঠের ধার ঘেঁষে
গাড়ি চলে যায় কোন নিরুদ্দেশে
আমারই মতো একলা হয়ত বা
ফিরে যায়, পুরনো রাস্তায়
নির্জন অভ্যাসে

বিগত দিন গুলো আসলেই
ছেনি হাতুড়ির মতো
স্তব্ধতা ভেঙে 'শিলকাটাই শিলকাটাই'
হাঁক পাড়ে হৃদয়ের গহীন ভিতরে

বালির, বালির কাছে ফিরে যাই
গুঁড়ো গুঁড়ো বালি হতে চেয়ে

বালির ওপর দিয়ে চিকন ঝর্ণা জল
কানে কানে বলে ক্রমাগত
'বিস্মরণে যাও', বিস্মরণে যেতে পারো
যদি, দেখবে জীবন আসলে সরল

তাপস কুমার রায় – যুক্তরাষ্ট্র সরকারে অর্থনীতির গবেষক তাপস কুমার রায় প্রাথমিকভাবে একজন চিত্রশিল্পী। কনেক্টিকাট বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাথরিন মায়ারের কাছ থেকে ফাইন আর্টস প্রশিক্ষণ লাভ করেন। তাপসের লেখায় ধরা পড়ে প্রবাস-এর একাকীত্ব এবং বাজারি সভ্যতায় তার বিপন্নতা। তার লেখা পূর্বে দেশ বা দুকুল-এর মত আন্তর্জাতিক বাংলা ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে এবং এছাড়াও বাঙালি চলচ্চিত্র গান হয়েছে। 'ঘর খোঁজা সন্ধ্যারা' তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা সংগ্রহ।

পঞ্চতপা দে সরকার

আজ একটা তুমি দিন হোক

আজ একটা তুমি ভোর হোক
আজ তুমি স্কার্লেট রঙে জেগে ওঠো আমার আকাশে,
রোদ্দুর হয়ে আজ কামড়ে দিয়ে যাও কানের লতি
শুভদিন না বলে, সবাই বলে উঠুক শুভ তুমিদিন,
অথবা শুভ হোক তুমি রঙের দিন ...
আজ একটা তুমি হয়ে যাক সারাদিন ব্যাপী
প্রতিশ্রুতিহীন দিন গুলোতে গোটা শহরে আজ তুমির মিছিল হোক,
অথবা কোন এক অভিসার কালে তুমি বিছিয়ে থাকো রাজপথ জুড়ে,
নতুন জুটিরা সব হেঁটে যাক তুমি বাঁধানো পথ দিয়ে ...
অঘটন তো রোজই ঘটে হেমন্তের দিনে,
আজ একটা তুমি ঘটে যাক,
যে স্প্যানিশ মেয়েটি ভোরের কাগজে, হারানো প্রেমকে খোঁজে প্রতিদিন,
জানলার কাঁচে আজ তোমাকে খুঁজে পাক,
ভরা জোয়ারে যারা মাছ ধরতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি কখনও,
সেসব ক্লান্ত উঠোনে আজ তুমি জেগে ওঠো।
এভারেস্ট অভিযানে হারিয়ে যাওয়া দিদিকে খুঁজতে যাবে বলে, যে ভাই মাটির ভাঁড়ে রেঁস্তো জমায় রক্ত বেচে,
সিরাজের গুপ্তধন হয়ে তুমি আজ আছড়ে পড়ো সেই ছেঁড়া পকেটের বিশ্বাসে।

বার্মুডা ট্রায়াঙ্গলে দিশা হারানো নাবিক বাবার কাঁধে মেলা ঘুরতে যাবে বলে যে শিশুটি কিশোর হয়ে ওঠে অবলীলায়,
আজ তার অপেক্ষারত নিথর চোখে, ব্যথা হয়ে নেমে এসো তুমি ।
অঘটন তো রোজই ঘটে ভরা বসন্তের দিনে আর রাতে,
আজ একটা তুমি ঘটে যাক শহরের বুকে,
আজ তোমার নামের প্ল্যাকার্ড হাতে রাস্তায় নামুক
সোমালিয়ার অভুক্তরা ...
অঘটন তো ঘটে প্রতিদিনই
আজ নাহয় শরৎ বৃষ্টির মতো তুমি ঘটে যাক একবার,
পোডিয়ামে হাঁটু কাঁপা, আজন্ম সামাজিক উদ্বেগে ভোগা মেয়েটির ভীত কণ্ঠে ফিদেল কাস্ত্রো হয়ে আজ ঝরে পড়ো তুমি,
অথবা অযুত ভিড়ের মাঝে ওর ঠোঁটে ঠোঁট রেখে অখণ্ড বিপ্লবের জন্ম দিয়ে যাও আরও একবার,
আজ একটা তুমি ভোর হোক, আজ তুমি ঘটে যাক চরাচর জুড়ে ...

পঞ্চতপা দে সরকার – পঞ্চতপা নিজেকে পদবীতে বেঁধে ফেলতে পছন্দ করেননা। উত্তরবঙ্গের রায়ডাক নদীর সঙ্গে বেড়ে ওঠা বলেই অক্ষরের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক সেই ছোট থেকেই, কারণ নদীর চেয়ে বড় কবিতা আর হয়না বলেই তার ধারণা। পেশায় নৃত্যশিল্পী, নেশায় সমাজসেবী হলেও নিজেকে অক্ষরশ্রমিক ভাবতেই ভালোবাসেন বেশি পঞ্চতপা ।

অভীক রায়

তারিখ

আরও একটা বছর নতুন হলো। অন্ধকারে দৌড় ঝাঁপের শেষে,
টিকে গেলাম আমরা কোনওমতে। অস্বস্তিকর নকল হাসি হেসে।
কান্নাকাটি ছিলো খানিক জুড়ে, মধ্যরাতে হারিয়ে ফেলার ভয়।
আর তারপর নিজেকে সান্ত্বনা – বাঁচতে চাইলে ঘুমিয়ে পড়তে হয়।
বিপদ আপদ নিত্যদিনের রুটিন। পা মচকানো, আচমকা মন ভাঙা।
যে নৌকাতে আমরা ভেসে আছি, দুঃখই তার একটিমাত্র ডাঙা।
আয়না যত বাড়ছে চারিদিকে, আমরা তত নিখুঁত হতে গিয়ে,
একের পর এক ভুল করেছি শুধু। পরস্পরকে টের না পেতে দিয়ে।
লোকদেখানো এই পৃথিবীর বুকে, অদৃশ্য এক ম্যাজিশিয়ান – তারিখ।
কাউকে সে খুব যত্নে গায়েব করে, কাউকে সে ঠিক ফিরিয়ে আনে বাড়ি।

সুগত খাসনবিশ

এক যাযাবর

সীমাহীন অনাদরে বেড়ে ওঠা
ঘাসের ওপর,
মাথা দিয়ে শুয়ে আছে শহরের
এক যাযাবর !
ঘন্টা মিনিট আর দিনের হিসেব কষা
মানুষের মাঝে,
শুয়ে আছে যাযাবর বেহিসেবী সময়ের
অগোছালো সাজে।
সফরের ক্লান্তিতে নেমে আসে ঘুম
তার চোখের পাতায়,
স্মৃতির সরণী বেয়ে পুরোনো ব্যথার কাঁটা
জাল বুনে যায়।
পাল্টানো সময়ের ঘেরাটোপ ঘটে চলা
সাপ-লুডো খেলা,
উদাসীন নির্মোহে দেখে চলে যাযাবর
দিনে দুই বেলা।
আকাশের উদারতা আঁধারের ছায়াতপে
ঢাকা পড়ে যায়,
ক্লান্তি জুড়ানো ঘুমে ঢলে পড়ে যাযাবর
বেলা বয়ে যায়!

তমঘ্ন গোস্বামী

পেন্ডুলাম

সময় বানায় ঘর,
ঘরের গর্ভে মন,
মনের দোসর মর্জি;
মর্জি নজরবন্দি।

নিয়ম সাজায় ইঁট,
ইঁটের ফাঁকে আলো,
আলো দোসর আড়াল;
আড়াল আঁটে ফন্দি।

আকাশ বানায় ডানা,
ডানা ভাসায় শরীর,
শরীর দোসর আগুন;
আগুন শ্মশান সঙ্গী।

ছোবল চাগায় আদর,
আদর জমায় বারুদ...
বারুদ দোসর ধোঁয়া;
ধোঁয়ায় জবানবন্দী।।

Tamaghna Goswami — Tamaghna teaches Psychology as a major subject to the undergraduate students since last 13 years. Spending time with unknown people and situations is his hobby. He is very passionate about wildlife adventure. Writing is his ultimate way of expression. His simple philosophy of life: "live and let live".

ব্রতী ভট্টাচার্য

অলীক

তুই যেদিন বললি ব্যথার রং খয়েরি কিংবা বেগুনি
আমি বললাম হয়তো, তবে তুই ব্যথা দিলে রং হবে ছলকানো লাল
ধোঁয়া উড়িয়ে হেসেছিলি তুই।
তোর সেই হাসি হালকা মেঘের মতো আউট্রাম ঘাট পেরিয়ে ছড়িয়েছিলো
সূয্যি ডোবা আবছায়া অপার দূরত্বে
সেই থেকে কত গোলাপী, হলুদ, বিকেল, সকাল এলো আর গেলো
লাল মেঝের গা ঘেঁষে তামাটে দুপুর কত নিবিড় ঘুমিয়ে রইলো তোর ঘামে, আদরে ...
জেগে রইল নিকষ কালো রাত তারাদের আলো গুনে ...

ইনফিউশন কফির বাদামী আশ্লেষে, হেলাল হাফিজের কবিতার নীলে
কিম্বা সুমনের 'জাতিস্মরে'র অবুঝ সবুজে
কোথায় রাখবো তোকে ? আমি দিশেহারা –
তোকে শুধু দেখবো বলে সম্ভব আর অসম্ভবে তফাৎ করিনি কোনো
আকাশ উপুড় করা শ্যাওলা রঙা আধডোবা শহরে,
এসপ্ল্যানেড-এর জমাট ট্রাফিক কিংবা কারফিউ ব্যারিকেডের
লাল কালো দিনেও মরিয়া আমি।

সত্যি বলার দায় ছিল না তোর –
রামধনু বুদবুদ কতটা অলীক জানি তো সকলে
লাল রং, খয়েরি বেগুনি হয়ে কখন যে বেরং হলো
কেবল কল্লোলিনী তার খোঁজ রাখে
আদরের সাদা নরমে ঢেকে রাখে সে সব ব্যথা ... তোর আমার।

রুদ্রশংকর

কেমন আছো, মারুফা ...

ফের চিলেকোঠায় দিকবদলের পালা চলছে আমার মধ্যে।
ফের চলতে চলতে
রোদের নীরবতার কাছে থামতে হল আরও একবার।
সেই নাচের মুদ্রায়, সেই কবিতার শরীরে
যতখানি মুগ্ধতা ছিল, তার সবটুকু
আমার না-লেখা পঙ্‌ক্তির ভিতর বেঁচে ওঠে অর্থহীন।
কি এমন স্পর্ধার মত্ততা ছিল?
কি এমন ঢেউ উঠেছিল পরবাসে?
এক ঘুরন্ত লাট্টুর মত নীল সম্ভবনার বীজ
নিজেকে প্রকট করে মেলে ধরতে চায়, মারুফা!

আমি কারোর প্রতিপক্ষ নই, হতেও চাই না কখনো।
অতল আনন্দে এক ঝাঁক উপেক্ষা ও দূরত্ব পান করি শুধু।
এই আমার উড়ুক্কু মন, এই আমার নির্জনতা জানে
ভালোবাসলে যে পতন হয় তার কোন সীমা নেই,
যে পোড়ায়, সেও একান্তে সবুজ তরঙ্গ নিয়ে পোড়ে।

রুদ্রশংকরের লেখালেখির শুরু নব্বইয়ের দশকে। ভারত বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য পত্রপত্রিকায় ও কবিতা সংকলনে লেখা প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা দশ। পেয়েছেন ভাসানগর পুরস্কার কবিতা আশ্রম প্রদত্ত কবি বিকাশ কুমার সরকার স্মৃতি পুরস্কার, বই-পার্বণ সম্মাননা ইত্যাদি। তাঁর কবিতা থেকে তৈরি হয়েছে একাধিক গান। গানের জন্য ২০২০ সালে পেয়েছেন মির্চি মিউজিক অ্যাওয়ার্ড।

শমীতা দাশ দাশগুপ্ত

পুতুলখেলা

আমার সামনে যে মেয়েটি বসে আছে, তার "মা" হবার বয়স হয়েছে বলেই মনে হয় না। এমন জটিল মাতৃত্ব তো দূরের কথা। এরই সঙ্গে কথা বলতে এসেছি আমি। বারবার নিজেকে মনে করিয়ে দিচ্ছি দেখতে কচি হলে কী হবে, মহিলা প্রাপ্তবয়স্ক। সুতরাং কঠিন প্রশ্নগুলো হাতে নিয়ে পা টিপে টিপে এগোতে হবে না – খোলাখুলি জিজ্ঞেস করতে পারি। তেমন তেএঁটে বিষয় নিয়ে চেপে ধরতে গিয়ে ইতস্তত করারও দরকার নেই। উত্তরদাতা দুঃখ পেল কিনা চিন্তা করার দায়িত্বও আমার নয়। তাও কেমন বাধবাধ ঠেকছে। মেয়েটা সত্যি কমবয়েসি। কত হবে – ম্যাক্সিমাম বাইশ তেইশ?

একটা নামিদামি বাংলা পত্রিকার মেয়েদের পাতায় আমি লিখি। জেন্ডার স্টাডিস নিয়ে এমএ পড়ার সুবাদে এই চাকরি। বাকি সাংবাদিক, যারা ওই পাতায় মাঝেমধ্যে লেখে, তাদের মস্তিষ্কে লিঙ্গ আর জেন্ডার-এর পার্থক্য এখনও খুব পরিষ্কার নয়। তাদের কাছে মেয়েদের পাতা মানে এলেবেলে কিছু একটা লিখলেই চলবে। নারীসমাজের বুদ্ধিমত্তার ওপর অগাধ আস্থা আরকি! আর আমি ? পাতার প্রধান লেখক, যদিও সম্পাদকের কলামে থাকে মালিকের নাম। তবে শুধু মেয়েদের পাতায় আটকে থাকতে আমি চাই না। আমার প্ল্যান, এখান থেকে তাড়াতাড়ি পাততাড়ি গুটোনো। তার প্রথম পদক্ষেপ হবে এই পত্রিকারই রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক সাংবাদিক পদ দখল করা – দুটোই সত্যিকারের গ্রাম্ভারি, সম্মানিত পোস্ট। তারপর হয় সম্পাদক হব বা কোনও ইংরেজি পত্রিকায় সরে যাব। সেই সুযোগ কেমন করে যে হাতে আসবে তা এখনও বুঝে উঠতে পারিনি। একটা সহজ উপায় আছে – মালিক-সম্পাদকের সঙ্গে একটু ইন্টুপিন্টু করা – আমার খিটকেল মানসিকতা আবার সেখানে ল্যাং মেরে রেখেছে। তক্কে তক্কে ছিলাম, তারপর হঠাৎই এই কেসটা হাতে এল। একটা দারুণ সিরিজ লেখার মশলা আছে এতে। সিরিজের নামটাও ঠিক করে রেখেছি – "শহরতলির সারোগেসি।" দারুণ না!

জেস্টেশানাল সারোগেসি নিয়ে যত হই চই আর গবেষণা হয়েছে, সব গুজরাত কেন্দ্রিক। আসলে "হোয়াট বেঙ্গল থিঙ্কস টুডে, ইন্ডিয়া থিঙ্কস টুমরো"র যুগ আর নেই। এখন হল "হোয়াট এভরি স্টেট থিঙ্কস টুডে, বেঙ্গল থিঙ্কস নেক্সট ইয়ার।" তাই সারোগেসি করে গুজরাত যখন ঝেঁটিয়ে ডলার ঘরে তুলেছে, আমরা তখন ভালো করে শব্দটা বানান করতেই শিখিনি। সারোগেসি, মানে কোনও মহিলা অন্য কারোর সন্তান নিজের গর্ভে ধারণ করবে, তারপর সেই সন্তানকে নিঃশর্তে দান করে দেবে যে শিশুর বায়না দিয়েছে, তাকে। অবশ্য সেই গর্ভদায়িনী মাতাকে একেবারে শুধুমুখে ফেরানো হবে না। তার গর্ভ দশমাসের জন্যে লিজ নেওয়া হয়েছে বলে মোটা টাকা পাবে। এ হল একবিংশ শতাব্দীর নতুন জমানায় বিজ্ঞানের উপহার।

ব্যাপারটার অবিসংবাদিত নায়ক গুজরাতের আনন্দ শহর। ডাক্তার নয়না প্যাটেল নামে এক উদ্যোক্তা ২০০৩ সালে ব্যবসাটার সূত্রপাত করলেন। প্রথম কেস, এক বয়স্ক দিদিমা নিজের কন্যা-জামাতার ভ্রূণ গর্ভে ধারণ করে তাদের সন্তান উপহার দিলেন আর সেই সঙ্গে ডাঃ প্যাটেলকে জগদ্বিখ্যাত করে তুললেন। এর আগে আনন্দের নাম সবাই জানত "আমূল দুগ্ধ সমবায় সমিতি"র কল্যাণে। এবার আরম্ভ হল "গর্ভ ভাড়া"র শিল্প। ডাঃ প্যাটেলের "আকাঙ্ক্ষা" ক্লিনিকের বাইরে বিদেশিদের লাইন লাগাল – গর্ভধারণে অক্ষম, সমকামী পুরুষ, ঋতু অন্তে নারী, "ধুত্তেরি, দশমাস ধরে কে ধ্যাস্টায়" মনোভাবাপন্ন হবু মাতা। আমাদের গরীব দেশ। ইয়োরোপ আমেরিকার এক দশমাংশ খরচে সন্তানলাভের এমন সুযোগ আর কোথায় পাওয়া যাবে! তারমধ্যে ভারতীয় মেয়েরা বাধ্য, মদ খায় না, মাদকাসক্ত নয়, সংযত জীবন যাপন করে। চাষের পক্ষে বড়ই ভালো জমিন।

মাতৃত্বের খোঁজে ক্লিনিকের সাজানো গোছানো সামনের গেট দিয়ে প্রবেশ করত বিদেশি ক্লায়েন্টরা আর পেছনের সার্ভিস দরজা দিয়ে ঢুকত গরিব গুজরাতি মহিলার সারি। একদল সন্তান চায় আর অন্যদল চায় আর্থিক স্বচ্ছলতা। সোনায় সোহাগা! মাঝখান থেকে বিশাল গাড়িবাড়ি, ফাইভ স্টার ক্লিনিক, আর কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার মালিক হয়ে বসলেন ডাঃ নয়না প্যাটেল। ব্যবসার বাণিজ্যিক সাফল্য আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণ করল। ফলে যা হবার তাই ঘটল। অসংখ্য সাংবাদিক আর সমাজতাত্ত্বিকদের ঢেউ আছড়ে পড়ল আনন্দ শহরে। তাঁরা গুচ্ছের গবেষণাভিত্তিক পেপার আর বই লিখে, ওয়েবসাইট স্থাপন করে আর কনফারেন্সে গিয়ে, সংগৃহীত তথ্য আর বৈজ্ঞানিক মতামত যথেচ্ছ ওগরাতে লাগলেন। প্রথমদিকে ডাঃ প্যাটেল তো মহা খুশি – বিনামূল্যে তাঁর ক্লিনিকের বিজ্ঞাপন হচ্ছে। তারপর দেখলেন নচ্ছার সাংবাদিক আর সমাজবিজ্ঞানীরা তাঁর এবং এই কাজের যথেষ্ট কটূ সমালোচনা করছে। সারোগেট মায়েরা নাকি চুক্তিমত টাকা পাচ্ছে না, তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা হচ্ছে না, তাদের ক্রিতদাসের মত আটকে রাখা হচ্ছে, প্রসবের পর তাদের মানসিক বা শারীরিক স্বাস্থ্যের তোয়াক্কা কেউ করছে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্যাস, অভিমানে নয়না দেবী সাক্ষাৎকার দেওয়া বন্ধ করলেন, আর সরকার কড়া আইন প্রণয়ন করল। আজকাল ভারতে পরার্থপর না হলে সারোগেসি বেআইনি। অর্থাৎ অন্যের সন্তান গর্ভে ধারণ করে সারোগেটরা টাকা দাবি করতে পারবেন না, এমনকি ক্লায়েন্টের কাছ থেকে স্বাস্থ্যবীমা "উপহার" টুকু পর্যন্ত নিতে পারবেন না। সরকার "নৈতিকতা" দেখাতে গিয়ে একটা রমরমা শিল্প শিকেয় তুলল।

গোটা ব্যাপারটা নিয়ে খুব একটা মাথাব্যাথা আমার কোনোওদিন হয়নি। গুজরাতে ব্যবসাটা দারুণ চলছে জানতাম। বাচ্চাকাচ্চার স্পৃহা আমার কোনওদিন ছিল না, এখনও নেই। বিয়েফিয়েও জীবনে করব বলে মনে হয় না। তবে যা হয়, বয়স বাড়তেই মা চাপ দিচ্ছিলেন এবার নাকি বিয়েটা করা দরকার। নইলে ওঁরা মরেও শান্তি পাবেন না। তাছাড়া আত্মীয়স্বজন কী বলবে! কথাগুলো মা মুখে বললেও আমার ধারণা বাবার অন্তরটিপুনিও তার মধ্যে যথেষ্ট। তিতিবিরক্ত হয়ে একদিন মা'কে বলে ফেললাম, "আত্মীয়রা বেশি জিজ্ঞেস করলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। বলে দেব আমি লেসবিয়ান।" সেই যে মা চুপ করলেন, এখন পর্যন্ত বিয়ে নিয়ে আর মুখ খোলেননি। বাবাকে কী ধমকি দিয়েছেন জানি না, কিন্তু দু'জনেই 'বিয়ে কর', 'বিয়ে কর' বলাটা ছেড়েছেন। সুতরাং এখন আমার ক্যারিয়ারের নকশা আমি নিজের মনে ছকে নির্বিঘ্নে এগোতে পারছি।

এরই মধ্যে কানে এল কলকাতার বুকে, মধ্যবিত্ত বাঙালি পাড়ায় একটা ফার্টিলিটি ক্লিনিক চালু হয়েছে। নামটা জম্পেশ – স্নেহ। জাঁকিয়ে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, "এখানে গর্ভধারণের সর্বপ্রকার সমস্যার সমাধান করা হয়", হোর্ডিং-এ বাচ্চা কোলে এক দারুণ ফর্সা, উচ্চবিত্ত দম্পতির ছবি। দেখে সাহেব মনে হয়। পরিষ্কার ইঙ্গিত সাধারণ আই-ভি-এফ-এর সঙ্গে সারোগেসি চলছে। ২০২১ সালে আইন পাশের পর থেকে গোটা দেশে সারোগেসি ব্যবসাটাই নিঃঝুম হয়ে পড়েছিল। অবশ্য টাকা আর মনুষ্যচরিত্রের নিবিড় সম্পর্ক সম্বন্ধে এতটুকু জ্ঞান থাকলে বুঝতে অসুবিধে হয় না কোনও কিছুই বন্ধ হয়নি, শুধু আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেছে। প্রথাটা কলকাতায় কখনই তেমন জনপ্রিয়তা পায়নি। তাই হঠাৎ কোভিড লকডাউনের শেষে এই ফার্টিলিটি ক্লিনিকের উদ্ভবে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। কারা আসছে এই ক্লিনিকে সন্তানলাভ করতে, কারা গর্ভ-ভাড়া দিচ্ছে? মনে হল পত্রিকার মেয়েদের পাতা থেকে বেরোবার এই হল আমার টিকিট। মালিকের কাছে একেবারে অজানা বিষয়, অজানা কুশীলব, অজানা ফলাফল। তার ওপর তদন্ত করতে গিয়ে যদি জালে রাঘব বোয়াল ধরা পড়ে তা হলে আমার ক্যারিয়ারের ঊর্দ্ধগতি ঠেকায় কে! সেটা হলে যা দারুণ হবে না, উফ্!

আজ প্রায় সপ্তাহ তিনেক উল্টো ফুটপাথ থেকে ক্লিনিকের ওপর নজর রাখছি। একটা চায়ের দোকানে বসি। সার্ভেলান্সের একটা ঠেক তো চাই! দোকানের মালিক আক্রাম ভাইয়ের সঙ্গে ভাব জমিয়েছি। সারাদিন চা খাই আর জায়গা দখল করে আছি বলে একটা ভাড়া দিই। দেখলাম ক্লিনিকে খুব একটা বিরাট ভিড় না হলেও সারাদিনই লোক চলাচল হয়। দেখতে দেখতে বেশ কয়েকজনের মুখও চিনে ফেললাম। জনা দুই ডাক্তার আসে দশটা নাগাদ – একজন

মহিলা। ইনিই নিশ্চয়ই সারোগেসি নাটকের মুখ্য নায়িকা। দু'তিনজন নার্স আসে – হয়তো রেজিস্টার্ড নয়, সেবিকা গোছের। এছাড়া ক্লিনিকের দরজায় চব্বিশ ঘণ্টা একজন দারোয়ান থাকে, সকালে পরিষ্কার করতে আসে একদল মহিলা। আরও বেশ কিছু কর্মী বিভিন্ন সময়ে কাজে আসে-যায়। মানে ফুল-ক্রু সহ জমজমাট ক্লিনিক।

চায়ের দোকানে সকালে আসি, রাতে যাই। ব্যাপারটা কী তা প্রথমে আক্রামকে বিশদ বলিনি। তবে রোজ রোজ একই প্রশ্নের উত্তরে কত আর মিথ্যে বলা যায় ! শেষে বলেই ফেললাম। আমার উদ্দেশ্য জেনে আক্রাম ভাই আমার খোঁজটা সহজ করে দিলেন।

"হায় রে! দিদি, আগে বোলনা থা! অদের ইন্ডারভ্যু চাও ? আরে, সোবাইকে ইখানে আসতেই লাগে। চা চাই না ? হাঁ, হাঁ, চিনিয়ে দিব। তবে আমার লাম দিবে লিখায়। লইলে না, হাঁ! লিখায় নাম গিলে দুকানের কাটতি বাড়বে, দিদি !"

আমি ঠিক কাদের সাক্ষাৎকার চাই তা অবশ্য আক্রামকে বলিনি। বলেছি এই যারা সাধারণ লোক, ক্লিনিকে আসে ... তারা কেমন চিকিৎসা পাচ্ছে তাই জানতে চাই।

"আরে দিদি, উদের বাচ্চা লাই। বাচ্চা লিবে। আর হামাদের দিদি, বুঝার আগেই চারখানা ... কী মুখে দিব, কী গায়ে দিব, ভেব্বে চুল সফেদ হইয়ে গেল ..."

আক্রম করিৎকর্মা লোক। ক্লিনিকের থেকে কেউ চা খেতে এলেই আমার দিকে তাকিয়ে চোখ নাচায়। আসে বেশির ভাগ ছেলেরা – নিম্নবিত্ত। পয়সাওয়ালা লোক আক্রামের দোকানে চা খেতে আসবে কেন ? অনেক সময় দেখি রাস্তার ওপারে বা দোকানের থেকে একটু দূরে একজন দু'জন মহিলা দাঁড়িয়ে – কমবয়েসি বউ বা মা-শাশুড়ির বয়েসি। পুরুষটি দু' বা তিন গেলাস চা কিনে নিয়ে যায় – তাদের দেয়, নিজে খায়। এরাই আমার টার্গেট।

প্রথমে আমি পুরুষটির কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিই। বলি ইন্টারভিউ করতে পারলে সামান্য সাম্মানিক দেবে আমাদের পত্রিকা। অনেকেই 'সাম্মানিক' শব্দটার মানে বোঝে না – তাদের ভেঙে বলি 'টাকা'। বেশ কয়েকজন ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ' বললেও শেষ পর্যন্ত পেছিয়ে গেছে। দু'জন ভুল ফোন নম্বর দিয়েছে। বাকি দু'তিনজন সরাসরি 'না' বলে হাটকে দিয়েছে। বুঝতে পারছি ক্লিনিক থেকে এদের পাঠ দেওয়া হয়েছে – বাইরের দুনিয়ার কাছে ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে। বিশেষ করে সাংবাদিকদের কাছ থেকে। দশ বারোজনকে ইন্টারভিউ করার প্রাথমিক ইচ্ছে এখন এক দু'জনে নেমেছে। ফ্রাস্ট্রেশনের পারদ যখন চড়ছে, হঠাৎই পেয়ে গেলাম এই মেয়েটাকে – রানি মণ্ডল।

রানিকে পেলাম এক অবিশ্বাস্য পরিস্থিতিতে। চোখ থাকলে যে কোনও মানুষই বুঝতে পারত এই মেয়েটির জীবনে ভয়ঙ্কর দুঃখের কিছু ঘটেছে। রানি বা ওর স্বামী আক্রামের দোকানে চা খেতে আসেনি। সেদিক থেকে ওদের চেনার কথা নয় আমার। সাধারণত আমি অপেক্ষা করি খরিদ্দারদের দিকে আক্রামের ইঙ্গিতের। সারাদিন কিছু ঘটার অপেক্ষা করাও খুব মুশকিল। প্রতিদিন বসে বসে বোর হই বলে খবরের কাগজ নিয়ে আসি – ইদানীং একটা বইও আনতে আরম্ভ করেছি।

সেদিন খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে দেখি ক্লিনিক থেকে এক অল্পবয়েসি দম্পতি বেরোচ্ছে। মহিলা ভেঙে পড়ছে পুরুষটির গায়ে – আর পুরুষ তাকে ধরে সোজা রাখার চেষ্টা করছে। দূর থেকে ভালো বুঝতে পারলাম না মহিলা কাঁদছে কিনা। ক্লিনিকের দারোয়ান হাঁ করে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। এমন সময় ভেতর থেকে একজন সেবিকা বেরিয়ে এল হাতে একটা পেটমোটা নতুন স্পোর্টস ব্যাগ। রাস্তায় বেরিয়ে দৌড়ে সেটা ধরিয়ে দিল সেই পুরুষের হাতে – তারপর আবার ফিরে গেল ক্লিনিকের অভ্যন্তরে। লোকটা এক হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে অন্য হাতে সঙ্গিনীকে ধরে এগোতে লাগল রিকশা স্ট্যান্ডের দিকে। দেখে মনে হল মহিলা হয় সন্তানসম্ভবা, নয় সদ্য জন্ম দিয়েছেন। সারোগেট? আর বেশি দেরি হলে আমার সুযোগ হারিয়ে যাবে। আমিও ছুট লাগালাম একটু দূরে দাঁড়ানো রিকশাগুলোর দিকে। আক্রাম পেছু ডাকল।

"অ দিদি, কুঁথা যাও ?"

ওকে উত্তর দেবার সময় নেই আমার।

মণ্ডল পরিবার রিকশায় ওঠার আগেই আটকাতে পারলাম। ওরা যাবে ক্যানিং – ট্রেনে। অফার দিলাম গাড়িতে যত্ন করে পৌঁছে দেব কিন্তু তার বদলে একটা সাক্ষাৎকার দিতে হবে। হয়তো মহিলার শরীরের অবস্থা দেখে বা অন্য কোনও কারণে ওরা রাজি হল। শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল আর রানি। আমি খুশ্ – ক্যাপটিভ পার্সনস। চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে পালাতে তো পারবে না !

প্রথমে কথা বলল শ্রীকৃষ্ণ। "আমাদের বলছে কারুর সঙ্গে কথা না কইতে। কইলে ভালা হবে নাই। কিন্তু গোটা পয়সাটাই দেয় নাই – আর কী খেতি করবে আমাদের !"

তাও শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল ইতস্তত করছিল, কিন্তু সমস্যার সমাধান করে দিল রানি।

"আমি রিকশ টেরেনয় যাতি পারব না। প্যাট খুল্যা বাইর হইয়ে যাবে। এই দিদি ডাকসেন, চল গাড়িতে যাই।"

অ্যাকসেন্টটা কোথাকার ধরতে পারলাম না। কেমন যেন মেশানো। বাড়ি বাংলাদেশে না পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে ?

গাড়িতে লাগবে বলে জলের বোতল, চা, আর কিছু বিস্কুট টিস্কুট কিনলাম আক্রামের দোকান থেকে। চোখ মটকে আমার দিকে তাকাল আক্রাম।

"আমার নাম ... মইনে রাখবে, দিদি। এইখানে বইঠছ তিন হফ্তা।"

না মনে রেখে উপায় আছে !

ক্যানিং-এ মণ্ডল পরিবার থাকে গ্রামের ভেতরে – টালির ছাদ দেওয়া দু'কামরার বাসা। বাসা বললাম কারণ বাড়ি বললে আবাসটাকে বেশি সম্মান দেওয়া হবে। গাড়ি থামাতে হল বেশ কিছুটা দূরে, একটা পুকুর পাড়ে, কাঁচা রাস্তার ওপর। আমার ড্রাইভার, মানে বাড়ির ড্রাইভার, রাজেনকে বললাম হাত মুখ ধুয়ে দাওয়ায় বসবে কিনা। গাড়ির চারপাশে বালখিল্যের ভিড়ের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি হেনে ও বলল, "না, গাড়িতেই থাকব"। রাজেন আবার গাড়ির ব্যাপারে ভীষণ দায়িত্ববান।

আমাদের তিনজনের প্রসেসান মণ্ডলদের বাসার কাছাকাছি পৌঁছতেই দৌড়ে এল দুটি বাচ্চা – নিজেদের খেলায় ছেদ ফেলে। দু'জনেই ঝাঁপিয়ে পড়ল মায়ের ওপর। তাদের পিছুপিছু পাড়ার কয়েকজন এসে হাজির। মনে হল সকলেই রানির স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন। সরাসরি রানিকে নয়, প্রায় সবাই ওর কুশল নিল স্বামী শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলের কাছ থেকে।

"অ কিস্নঅ, রানির শরীল আকুন কেমন গো ?" "আহা, ডাগদারে ছাওয়ালটা বাঁচাইতে পারল না ?" "কী হইস্ল বলল কিসু ?" "যাগ গে, ঠাকুরের কির্পায় আর দুইটা তো আসে !" "দুক্খু করিস না, রানি।"

বহু সান্ত্বনার স্রোতের মুখে দুটি পাঁচ-ছ' বছরের ছেলেকে বুকে জড়িয়ে পাথরের মত বসে রইল রানি। থেকে থেকে চোখ মুছছে। ভেতর থেকে এক বয়স্ক মহিলা উঁকি দিলেন বার তিনেক। আমার দিকে চোখ তুলে রানি বলল, 'শাউড়ি'। প্রায় চল্লিশ মিনিট কেটে গেছে – উশখুশ করছি। ইন্টারভিউর সময় কখন হবে? ধীরে ধীরে প্রতিবেশী মহিলারা বিদায় নিলেন – রানির কেসটা যত মজাদারই হোক না, সকালে বাড়ির কাজের চাপ তো আর উবে যায়নি! কিছুক্ষণ বাদে বাচ্চাদুটোও বন্ধুদের সঙ্গে অসমাপ্ত খেলা শেষ করতে দৌড়ল। ছোটো শিশু, এক জায়গায় আর কতক্ষণ বসে থাকতে পারে! ভেতর থেকে আঠারো উনিশ বছরের একটি মেয়ে একটা থালার ওপর তিনটি কাচের গ্লাসে চা এনে আমাদের

সামনে মোড়ায় রেখে আবার ঝট করে ভেতরে ঢুকে গেল। এখন আমার সামনে বসে শুধু রানি আর শ্রীকৃষ্ণ। কী জিজ্ঞেস করব এদের ?

"আপনাদের পাড়াপড়শি জানে আপনার বাচ্চা মরে গেছে ? তাই বলেছেন ওঁদের ?"

জবাব দিল শ্রীকৃষ্ণ। "কিছু তো বইলতে হবে। পোয়াতি হইল কিন্তু বাচ্চা বাড়ি আইনল না ..."

রানি তখনও মাথা নীচু করে বসে। দু'গালে জলে ধারা শুকিয়ে শাদা, খড়িওঠা দাগ হয়েছে।

"আর বাড়ির লোকেরা ?"

"তারা জানে।"

"কবে ঠিক করলেন সারোগেসি করবেন ?"

এখনও শ্রীকৃষ্ণ প্রধান বক্তা। "আমি শঅরে ছিক্যুরেটি ডিউটি করি – সিখানে অন্য গাডরা বলল। তাদের বাড়ির মেয়্যারাও করে। একজন তো বড়লোক হইয়ে গ্যাসে। আমার বইলতে সাওস হয় নাই।"

এইবার রানি নড়েচড়ে বসল। "না, ও বলে নাই। বলসি আমি।"

শ্রীকৃষ্ণ চারপাইয়ে বসে নখ খুঁটছে। রানির মুখ থেকে যতটা পারি ঘটনাটা জানতে চেষ্টা করলাম। কেন সারোগেসির ঝুঁকি নিয়েছে সাধারণ, নিম্নবিত্ত, পড়াশোনা কম জানা এই দু'জন মানুষ? নিজেদের গল্প বলতে রানি দ্বিধা করল না।

শ্রীকৃষ্ণর তিন বোন – শ্বশুর বেঁচে থাকতে দু'জনের বিয়ে দিয়ে গেছেন। বাকি সবচেয়ে ছোটো ননদ – দাদা-বৌদির দায়িত্ব। সেই মেয়ের বিয়ের ঠিক হয়েছে – পাত্র ভালো, কিন্তু যৌতুক চেয়েছে হন্ডা মোটরবাইক। আর খাট, আলমারি তো দিতে হবেই। সবাই বলল পণ চায়নি, শ্রীকৃষ্ণের ভাগ্য ভালো। এ পাত্র যেন হাত ফস্কে হারিয়ে না যায়! কিন্তু টাকা? শাশুড়ি রোজ চোখের জল ফেলে, ননদ শুকনো মুখে ঘুরে বেড়ায়। শ্রীকৃষ্ণ শুধু নামেই জগতের কাণ্ডারী – নিজের বোনকে পার করতে হিমশিম খেয়ে গেল।

"অর দুক্ষু আর আমি সইতে পারি নাই। বইললাম আমি কৈরব। এমন কী বড়ো কাজ – দুইটা ছাওয়াল তো এই প্যাট থিক্যেই বাইর কইরসি।"

এইবার ভেঙে পড়ল রানি। "দিদি, বুঝি নাই নাড়ি ছেরা ধন দিতে এত বেথা লাগব।"

এতেই শেষ নয়। রানির গল্পটা আরও বড়ো, আরও জটিল।

কলকাতা বেড়াবার নাম করে যেদিন ওরা দু'জন 'স্নেহ' ক্লিনিকে গেল, দেখা গেল রানি প্রেগন্যান্ট। ওরা হতচকিত। দুটো বাচ্চাকে দু'বেলা খাওয়াতে পারছে না – আরও একটা? আর ননদের বিয়ে? তার কী হবে! ক্লিনিকই সব ব্যবস্থা করে দিল। অ্যাবর্শন, রিকাভারির সময়, তারপর প্রিনেটাল ভাইটামিন, প্রেগনান্সি।

"আমি আর কী বইলব, দিদি, সবই সহজে হইল। একবারেই লাইগছে।"

রানির সার্ভিস কন্ট্রাক্ট হল অস্ট্রেলিয়ার এক 'বাঁজা' দম্পতির সঙ্গে। 'বাঁজা' শব্দটা আমার নয়, শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে শোনা। প্রেগনান্সির মাস পাঁচেক হতেই নিয়মমাফিক রানিকে একটা হস্টেলে গিয়ে থাকতে হল, তাতে ডাক্তারদের পক্ষে

ওকে মনিটার করা সহজ। এই প্রণালীগুলো আমার চেনা। কলকাতার স্নেহ ক্লিনিক ডাঃ নয়না প্যাটেলের সারোগেসি প্রোটোকল মাফিক চলছে। হস্টেলে যাবার পর, সেই অস্ট্রেলিয়ার দম্পতি রানির সঙ্গে যোগাযোগ করল। "ফুঁনে ছবি দিয়া কতা বইলতেন।"

"আর তোমার বাচ্চারা ?"

শাশুড়ি আসেন – ননদ আর শ্রীকৃষ্ণও। রানিই একা ছিল, স্বামী, সন্তান, পরিবারহীন। ও-ও 'ফুঁনে' বাচ্চাদের ছবি দেখত, কথা বলত। সবাইকে বলা হল এবারে রানির বাচ্চা হতে প্রাণসংশয় হবে, তাই বাবা-মায়ের কাছে থাকছে – বিশ্রাম করছে। হস্টেলে রানি ছাড়াও আরও দু'তিনজন মহিলা ছিলেন। প্রসবের সময় কাছে আসাতে ওদের বলা হল এত মূল্যবান বাচ্চা – কোনও ঝুঁকি নেওয়া যাবে না। সিজেরিয়ান করা হবে।

"তা প্যাট কাটার আগেই ব্যাথা উঠ্যে বাচ্চা হইয়ে গেল, দিদি। রাতের বেলা। তাইতে ডাগতার ম্যাডামের কী রাগ!"

দু'দিন পরেই অস্ট্রেলিয়ার সেই দম্পতি এল নিজেদের 'দামি' বাচ্চাকে তুলে নিতে।

"আমি বইলেছিলাম, দিদি, দিব না। মেয়্যাডারে বাড়ি নিব গিয়া। কী সোন্দর দ্যাখতে! তা ডাগদার ম্যাডাম বলল টাকা নিইসি, কাগজে সই করসি, পুলিশে ধইরবে, জেল হইবে।"

বাচ্চাটাকে তার অন্য বাবা-মায়ের কাছে তুলে দিয়ে রানি ভেঙে পড়েছিল। ওর কান্না দেখে সেই দম্পতি আশ্বাস দিয়েছে প্রতি তিনমাস অন্তর ওকে 'লিলি'র ছবি পাঠাবে, ফোন করে জানাবে মেয়ে কেমন আছে। সেই আশায় রানি বুক বেঁধেছে।

শ্রীকৃষ্ণ জানাল, "ডাগদার পুরা টাকা দিলে নাই। বলে প্যাট কাটতে পারে নাই তাই পুরা টাকা দিবে নাই।"

তাকিয়ে দেখি, রানির দু'গাল আবার জলে ভেসে যাচ্ছে। কী বলব আমি ? কী সান্ত্বনা দেব সন্তান শোকে কাতর ক্যানিং-এর গরীব মা'কে ? ওর সন্তান ভালো থাকবে – ঘি-দুধ মেখে বড়ো হবে ? দুঃখ না করতে ? পারলাম না। কেন জানি মুখ থেকে কথাগুলো বেরোতে অস্বীকার করল। স্ত্রীর হাত ধরে শ্রীকৃষ্ণ করুণ সুরে বলল, "ভাবিস নাই, হইয়ে যাইবে। মটরবাইক হইয়ে যাইবে।"

রানি আমার দিকে তাকাল। "আমি চ্যান কইরতে যাই, দিদি। আজ পূজা দিব। অনেক দিন হইল দিই নাই। ভগবান করেন, আমার তিনডি সন্তান যেন সুখে থাইকে, ভালো থাইকে।"

ক্যানিং থেকে ফিরছি গাড়িতে। কোনও দিকে তাকাতে ইচ্ছে করছে না, কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। বুকের ঠিক মাঝখানটায় একটা ফাঁকা গর্ত। সন্তান! কী এমন জিনিস যা খেতে না পাওয়া ওই দরিদ্র মেয়েটার জীবনের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে ? টাকার চেয়ে অনেক দামি, অনেক দুর্মূল্য নাকি ? অমন জিনিসটার স্বাদ আমি জীবনে পাব না ? সন্তান ! আমি তো কোনওদিন চাইনি ! বড়ো কিছু মিস করছি নাকি ! নাঃ, ব্যাপারটা নিয়ে আর একটু গভীরভাবে মা'র সঙ্গে আলোচনা করতে হবে!

শমীতা দাশ দাশগুপ্ত – একজন শিক্ষক, গবেষক, ও সমাজকর্মী। পাঁচ দশকের বেশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণ এশিয় সমাজে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলা ও মহিলাদের ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টায় নিযুক্ত। উত্তর আমেরিকার প্রথম দক্ষিণ এশিয় পারিবারিক নির্যাতন বিরোধী সংস্থা, মানবী'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। অভিবাসী দক্ষিণ এশিয়, ফার্স্ট নেশান (নেটিভ আমেরিকান) সম্প্রদায় সহ মার্কিন দেশের বিভিন্ন প্রান্তিক গোষ্ঠীর সঙ্গে বহুদিন কাজ করছেন। ইংরেজিতে প্রকাশিত পাঁচটি বই ও বেশি কিছু গবেষণামূলক প্রবন্ধ রয়েছে। বাংলা লেখার আরম্ভ কবিতা দিয়ে। তাছাড়া রহস্য গল্পের তিনটি বই রয়েছে।

সুমিতা বসু

জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ

খাঁচার ভিতর

– টমটমকে খাঁচায় ঢোকাও জয়, হোসের ঘাস কাটা হয়ে গেলে আবার বের কর, এই কথা বলে আমি আবার Yaa Gyasi-র Homegoing বইটায় মন দিলাম। শনিবারের বিকেল চা'য়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে প্যাটিওতে বসে এই বই পড়ার বিলাসিতাটা আমার বড় প্রিয়, অন্তত যতদিন না ম্যারিল্যান্ডের এই অঞ্চলে ঠান্ডা পড়ছে। জয় এতক্ষণ ওর প্রাণের খরগোশ টমটমের সঙ্গে বাগানে ছুটে বেড়াচ্ছিল। খুব বিরক্তি দেখিয়ে টমটমকে পাঁজকোলা করে এনে প্যাটিওর এক কোণায় রাখা খাঁচার দরজাটা খুলল। হোসেকে চেঁচিয়ে বলল, তাড়াতাড়ি করো তো, টমটমের খাঁচায় থাকতে একটুও ভালো লাগে না !

টমটমের মোটেই খাঁচার ভেতরে যাবার ইচ্ছে নেই, ওইটুকু প্রাণী হলে কি হবে, বেশ প্রতিবাদ জানাচ্ছে। আমি বই থেকে চোখ তুলে একটু হেসে ওদের কান্ড কারখানা দেখে আবার অন্যমনস্কভাবে বইয়ের মধ্যে ডুবে গেলাম।

হয়তো কয়েক মিনিট কেটে গেছে, কোনো আওয়াজ নেই ! চোখ তুলে দেখি এক অদ্ভুত দৃশ্য ! দেখি, হোসে তার ঘাস কাটার মেশিনটা বন্ধ করে চোখ ছলছল করে খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। জয়ও ব্যাপারটায় একটু হতভম্ব হয়ে খাঁচার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে। আর টমটম খাঁচার দরজায় প্রাণপণে আঁচড়ে যাচ্ছে। দৃশ্যটা প্রায় ছবির মতো লাগল। ব্যাপারটা কী বোঝার জন্য উঠে গিয়ে সামনে দাঁড়াতেই, হোসে অঝোরে কাঁদতে লাগল আমার দিকে চেয়ে। এবার আমার হতভম্ব হবার কথা। আজ পাঁচ-ছ'বছর হোসেকে দেখছি, নিজের মতো সময়ে আসে, ঘাস কাটে, চলে যায় – এরকম তাজ্জব ব্যাপার কখনো দেখিনি !

কাছে গিয়ে বললাম, কি হল হোসে, বাড়িতে সব ভালো তো ?

হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল সে, না ম্যাডাম একেবারে ভালো না। এই রকম . . . ঠিক এই রকম এক খাঁচায় ওরা ইউ এস বর্ডারে আমার বোনের তিন বছরের ছেলেটাকে জন্তুর মতো খাঁচায় আটকে রেখেছে, আজ দু'মাস। বল ম্যাডাম, কী করে আমরা ভালো থাকব, বল ! আজ টমটমকে খাঁচার দরজা আঁচড়াতে দেখে মনে হল, আমার ভাগ্নের তো কেউ নেই ওখানে ! খাঁচার দরজায় ধাক্কা দিলেও জয়ের মতো কেউ নেই যে ওকে কোলে তুলে আদর করবে ! ওর মাত্র তিন বছর বয়স ম্যাডাম, ভাবতে পারো ?

গলার কাছে এক পাথরের দলা আটকে গেল।

অসাম্যের কদাকার নগ্ন চেহারা দেখি দিনরাত – খবর দেখি, পড়ি – টিভিতে, কাগজে। পোশাকি ভাষায় এর একটা বাহারী নামও আছে, Policy। যুগ যুগ ধরে মানুষের বৈষম্যের শিকার হয়ে মানুষের এতো চোখের জলেই বুঝি পৃথিবীর তিন ভাগই নোনা জল – আর আমরা তাকে বলি সমুদ্র !

অচিন পাখি

আরাধনা মাসির সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল পিঙ্কিদের বাড়িতে। পিঙ্কি আমার যাদবপুরের বন্ধু। আটলান্টা থেকে কাজে কর্মে যখনই ডালাসে আসি, ঠিক সময় বের করে পিঙ্কির কাছে ঢুঁ আমি মারবই। এবার ফোন করতেই, পিঙ্কি

আমার দিকে থেকে আরাধনা মাসি চোখ সরিয়ে নিয়ে সোফার পাশে রাখা পিঙ্কির একটা হাউস-প্লান্টের বোধহয় প্রতিটি পাতা গুণতে লাগল, খুব মনোযোগ দিয়ে। আর আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল, সেই শেষ যেদিন আরাধনা মাসিকে আমাদের বাড়িতে দেখেছি, সেই দৃশ্যটা। কোনো বন্ধুর বিয়ে বলে মায়ের কাছ থেকে লুকিয়ে জড়োয়া গয়নার সেটটা নিয়ে ব্যাগে ভ'রে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল ছুটে ছুটে। আমায় দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখে বলল, শুভ্রব্রত একটু বাসে উঠিয়ে দাও না। সন্ধ্যে হয়ে গেছে, আমি তখন সবে টিউশন সেরে ফিরেছি। বাবা বা ছোটকাকু কেউই বাড়িতে ছিল না। আমি পিঠের ব্যাগটা সিঁড়িতেই নামিয়ে রেখে, মা, একটু এগিয়ে দিয়ে আসছি, বলে আরাধনা মাসির সঙ্গে বাস স্টপ পর্যন্ত গিয়েছিলাম। মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে বলেছিল, আরাধনা খুব সাবধানে যেও আর পরশু এসে দিয়ে যেও ওটা। তখন আমি 'ওটার' মানে বুঝিনি, পরে সব শুনেছিলাম।

তারপর পরশু এবং আরো অনেক পরশু কেটে গেল আরাধনা মাসি আর আসেনি ফিরে। ছোটকাকু অনেক ছোটাছুটি করেছিল কিন্তু ঠিকানাই নাকি ভুল ছিল। থানা পুলিশ সবই হয়েছিল। টিভি স্টেশনও কোনো বিশেষ খবর দিতে পারেনি। আর কোনোদিন আরাধনা মাসিকে টিভিতেও দেখিনি। ছোটকাকু তো লজ্জায় রাগে দুঃখে মাথাই তুলতে পারেনি। বাবাও খুব মন খারাপ করেছিল। মা'র চোখের জল দেখে তারপর একদিন বাবা বলেছিল আমার সামনেই, অন্তত এক দেড় লাখ টাকা দাম তো হবেই, তবু মন খারাপ করো না, আমি আবার একদিন না একদিন গড়িয়ে দেব তোমায় !

শুধু ঠাম্মা, বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলেছিল, আমি জানতাম, আমি চোখ দেখে মানুষ চিনতে পারি – অচিন পাখি ! তারপর মায়ের হাত ধরে বলেছিল, মধুরা পৃথিবীটা ঠগ জোচ্চোরে ভর্তি, তোমার মতো বড় ঘরের মেয়েও না সে, আবার মানুষ হিসেবেও তোমার মতো দেবতুল্য নয় – এবার বোঝো। তুমি সবাইকে সরল মনে বিশ্বাস করে বসে থাক !

আমি সেদিন সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম, মা তখনো কাঁদছিল। ঠাম্মা আমার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিল, দেখে শেখ তুমিও দাদুভাই, যাকে তাকে ধরে এনো না বাড়িতে, পরিবার বংশ দেখো। ঠাম্মা আরো বলেছিল, যাক যাক, তবু একটু পয়সার ওপর দিয়ে গেল, এরপর ওই মেয়ে বাড়িতে গাঁটছড়া বেঁধে ঢুকলে আমাদেরও সকলকে মেরে ধরে বাড়ি ফাঁকা করে একেবারে উড়িয়ে হাওয়া করে দিত !

পিঙ্কি একটু অবাকই হল, কোনোমতো খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে এলাম তাড়াতাড়ি । ড্রাইভওয়ে থেকে গাড়িটা ব্যাক করতে করতে ঠাম্মার গলাটা স্পষ্ট কানে ভেসে এল, তবে যাই হোক, মানুষ ঠকালে নিজেকেও ঠকতে হবে। যতই ওপর চাল দিক না কেন, চোখের জলে কাটবে ওর জীবন, এই কথা আমি বলে রাখলুম। আপদ গেছে, কোথাকার কোন অচিন পাখি !

হঠাৎ মনে পড়ল ফোন-এ পিঙ্কি বলেছিল, দারুন স্টাইলিশ মহিলা কিন্তু শুনেছি খুব দুঃখের জীবন !

ক্যামনে আসে যায়

– আরেকটু জোরে শ্বাস টানো বাবা, আর একটু জোরে। . . . এই বনী একটু জল আন তো বাবার জন্যে – এই কথা বলে চৈতি বাবার বুকে পিঠে তেল মালিশ করতে করতে খুব যত্ন করে হাত বোলাতে লাগল। পাঁচ দিন হয়ে গেল জ্বর নামছে না সন্তোষের, খাওয়ায় রুচি নেই, চোখ ঘোলা ঘোলা। মেয়েদের বলেছে কাউকে কিচ্ছু না বলতে, এক্কেবারে কথাটা যেন না বেরোয়, তাহলেই পাড়ার লোক ধরে হাসপাতালে পুরে দেবে। এই পনেরোটা বছর একা একা দুই মেয়ে নিয়ে সন্তোষ মিস্ত্রি তিনজনার ছোট্ট সংসার টানছে। প্রথম সন্তান জন্মালো সে বছর মার্চ মাসে, তখনও বিশেষ গরম পড়েনি। খুব সাধ করে চৈত্র মাসে জন্মেছে বলে বৌ – বড়মেয়ের নাম রেখেছিল, চৈতি।

দারুণ উত্তেজিত হয়ে বলল, জানিস শুভ, আমার ঠিক পাশের বাড়িটা একটা বাঙালী মেয়ে কিনেছে, ভাবতে পারিস, my very next door neighbor is a Bengali। ওর মা এখানে এসে এখন কোভিডের জন্য আটকে গেছেন। রোজ দারুণ রান্না করেন আর দিয়ে যান, আহা, কত পুণ্যের ফল বল তো ? আসছিস কবে এদিকে ? ভদ্রমহিলা খুব স্টাইলিশ কিন্তু শুনেছি খুব দুঃখের জীবন, ডিভোর্সি, একাই মেয়েকে মানুষ করেছেন। তুই আয়, আলাপ করিয়ে দেব। তুই এলে ওদের একদিন ফরমাল-ভাবে ডাকব।

বললাম, সামনের সপ্তাহেই আসছি, লাগিয়ে দে তোর পার্টি !

অতএব এই আয়োজন।

ঘরে ঢুকে, পিঙ্কি কিছু বলার আগেই আমি আরাধনা মাসিকে দেখে স্তম্ভিত। এতো বছর পরেও চেহারাটা একই আছে, থুতনির মাঝখানে বড় তিলটাও। বললাম, আরাধনা মাসি, তুমি ?

মনে হল, আরাধনা মাসীও আমাকে দেখে ভয় পাওয়ার মতো চমকে গেছে।

– আরে, তুই চিনিস নাকি ? তুই যে কাকে চিনিস না শুভ ? পিঙ্কিও অবাক।

আরাধনা মাসির সঙ্গে আমার সেই ১৯৮২ সালের পর এই প্রথম দেখা ! শেষ দেখাটাও মনে আছে পরিষ্কার, সে কথায় আসছি। ১৯৮১-৮২ সালের দিকে আরাধনা মাসির ঘন ঘন যাতায়াত ছিল আমাদের বাড়িতে, আমি তখন পাঠ ভবনে ক্লাস টেন-ইলেভেনে পড়ি। ছোটকাকুর সঙ্গে আরাধনা মাসির চুটিয়ে প্রেম চলছে, ঠাম্মার কিন্তু বেশ আপত্তি ছিল। আরাধনা মাসির বাড়ি নাকি মফস্বলে – কাকিনাড়া, না কোথায়, আর আমরা তিন পুরুষে কলকাতার বর্ধিষ্ণু পরিবার ! তাছাড়া পরিবারের কারো সঙ্গে আলাপও করা হয়নি গত দু বছরে – মনে হয় সেটাই ছিল ঠাম্মার প্রধান আপত্তির কারণ।

বাবার আর ছোটকাকুর বয়সের তফাৎ চোদ্দ বছরের, তাই বাবা ছোটকাকুকে খুব স্নেহ করত। মেজকাকু বরাবর দিল্লিতে, কলকাতার বাড়িতে ঠাম্মা আর আমরা। আর ছিল ছোটকাকু। আমার মা'র কাছেও ছোট দেওর খুব আদরের। মা ছিল সব কিছু ম্যানেজ করার জন্য – একদিকে ঠাম্মা আর অন্যদিকে ছোটকাকু ও আরাধনা মাসি। ছোটকাকু খুব ভালো সরোদ বাজাতো। এরকমই একবার টিভি-তে সরোদ বাজাতে গিয়ে আরাধনা মাসীর সঙ্গে আলাপ, আর বলা বাহুল্য, সঙ্গে সঙ্গেই তা হয়ে গেল প্রেমালাপ। আরাধনা মাসি সুন্দর নজরুলগীতি গাইত। ঠাম্মা সুযোগ পেলেই ঠেস দিয়ে দিয়ে বলত, যাকে তাকে বাড়িতে আনো, এরপর প্রেমালাপ আবার বিলাপ প্রলাপ না হয়ে দাঁড়ায়। আরাধনা মাসী একাই আসত আমাদের বাড়িতে আর এসে বাকিদের এড়িয়ে, হয় ছোটকাকু নয়তো মায়ের সঙ্গে গল্প করত। ঠাম্মা দেখতে পেলেই বলত, কোথাকার এক ধিঙ্গি মেয়ে ! মা আবার ছোটকাকুকে একটু আস্কারা দিত, তাই বলত, তুমি এতো negative কথা বোলো না তো মা, ক'দিন পরে ও-ই তোমার ছোট বৌ হয়ে আসবে এ বাড়িতে।

এতদিন পর পিঙ্কির ডালাসের বাড়িতে যে এভাবে আরাধনা মাসির সঙ্গে আচমকা দেখা হয়ে যাবে, ভাবতেও পারিনি। আরাধনা মাসির মেয়েটার ভারী মিষ্টি চেহারা, নাম বলল, রাধিকা। একটু আলাপ করার চেষ্টা করলাম, বিশেষ জমলো না ! রাধিকা হঠাৎ, 'যাই পিঙ্কি দি'কে একটু হেল্প করি', বলে উঠে গেল।

যেখানে যাই সেখানেই আমি জমিয়ে নিই, এই রকম এক সুনাম বা দুর্নাম আছে আমার কিন্তু এই মুহূর্তে ভীষণ অস্বস্তি লাগছে একা একা আরাধনা মাসির সামনে ! আরাধনা মাসিরও কেমন ছাড়াছাড়া ভাব ! পিঙ্কি অনেক রান্না করেছে, সে খাবার-দাবার গরম করতেই ব্যস্ত। চেঁচিয়ে বলল, এই শুভ, একটু গল্প কর তো, রাধিকার মা খুব ভালো নজরুলগীতি করেন, একটু গান হয়ে যাক, আমি খাবারগুলো গরম করতে করতে আর গোছাতে গোছাতে, এখান থেকেই শুনব।

তার আড়াই বছর পর ছোট মেয়ে হতে গিয়ে সে চোখ বুঝলো। সেটা ছিল অগাস্ট মাস, বাংলায় শ্রাবণ। অপারেশন টেবিলেই জন্ম ও মৃত্যুকে পাশাপাশি রেখে, ডাক্তার মুখটা নিচু করে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল,

– ভালো মন্দ দুটো খবরই আছে। ভালোটাই আগে দিই, আরেকটা ফুটফুটে মেয়ে হয়েছে আপনার। কিন্তু ... খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, দুঃখিত, মাকে কিছুতেই ধরে রাখতে পারলাম না ! ছোট্ট চৈতিকে বুকে নিয়ে মাথায় বাজ পড়েছিল সেদিন।

ক'দিন পর মা-মরা শিশুটিকে ঘরে আনতে বুক ভেঙে গেলেও, মাথার ওপর অনেক অনেক দায়িত্ব, সন্তোষ চোখের জল মুছে শক্ত থেকেছে। শ্রাবণে জন্মালো বলে এর নাম রাখলো সন্তোষ নিজেই, শ্রাবণী ! পাড়ার আর পাঁচজনের কোলে পিঠে দুই কন্যা বড় হতে লাগলো। সন্তোষ মিস্ত্রির দুঃখের ঘরের প্রদীপ ওরা – ভারী লক্ষ্মী ! সকালে দুই বোন দুটো ঠিকে কাজ সেরে, বাড়ি এসে ভাত ফুটিয়ে, বাবার খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে স্কুল যায়। আবার ফিরে হোমওয়ার্ক, টিউশনি। ক্লাস টেন আর টুয়েলভে পড়ে দু'জন, পড়াশোনাতেও খুব মন। খুব ইচ্ছে দুজনেরই – কলেজে পড়ার, দেখা যাক। মেয়েদের পড়াতেই হবে, আর ... দাঁড়িয়ে বিয়ে দেবে। ব্যাস, একটুকুই স্বপ্ন সন্তোষের।

সন্তোষের নিজের বিদ্যে ক্লাস সেভেন, তারপর থেকেই অভাবের সংসারে – কাজ আর কাজ। উল্টোডাঙার বাজার থেকে আনাজ-পাতি কিনে ভ্যান-রিকশা করে বাড়ি বাড়ি বিক্রি করা থেকে ইলেকট্রিক মিস্ত্রির কাজ, সবেতেই হাত পাকিয়েছে। তবে না, বেপথে যায়নি কখনো, আছাড় খেতে খেতেও কোনোমতে সামলে নিয়েছে। কোথাও যেন বুকের মধ্যে একটা ভয় কাজ করতো সবসময়, অজানা পাপের ভয় ! আর বিনোদ মাস্টারের একটা কথা, সব সময় মনে রাখবি, God only helps those who help themselves। এটাই নিজের অজান্তে কবে জানি হয়ে গেল সন্তোষের বীজমন্ত্র। চোখের সামনে মেয়েদুটোকে দেখে আর অবাক হয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে পরম সৌভাগ্যের কথা ! ভাবে – কোথাও না কোথাও উপরওয়ালা ঠিক শুনতে পেয়েছেন তার মন্ত্র আর তাই তো এতো কষ্টেও এতো সুন্দর ফুলের মতো উপহার এ জীবনে।

এই ক'দিন একটু বেশি কাজ করতে গিয়েই বিপদ হলো, যা ভয় পাচ্ছিলো, হয়তো তাই ! সাবধানে থেকেও কোথা থেকে ঐ মারণব্যাধি, করোনা নাকি বলে নিশ্চয়ই ওটাই হবে – যা যা শুনেছিল উপসর্গগুলো সব হুবহু মিলে যাচ্ছে ! আবার শ্বাসের কষ্ট হচ্ছে – দুই বোন আকুল হয়ে বাবার মুখের দিকে চেয়ে আছে।

– কিছু ভাবিস না তোরা, হাঁফাতে হাঁফাতে সন্তোষ বলে, সব ঠিক হয়ে যাবে, কাউকে কিছু বলিস না আর দরজাটা সবসময় বন্ধ রাখ . . . কে জানে, এখন ধরা পড়লে আরো বিপদ, মনে মনে বলল। শুনেছে, জানাজানি হলে একেবারে সরকারী হাসপাতাল তারপর সেখান থেকে ধাপার মাঠ, ডোমেরাই কাজ সারবে। মেয়েদুটোকে কিছুতেই অনাথ করতে পারবে না সে, এই সময়, সামনে ওদের বোর্ডের পরীক্ষা। অতএব, চুপ করে ক'টা দিন একটু লুকিয়ে থাকা . . .

দরজায় কেউ একটা কড়া নাড়ছে ঘন ঘন। চৈতি আর শ্রাবণী ভয় পেয়ে বাবার মুখের দিকে চাইল, খুলবো বাবা ?

– না না চুপ করে বসে থাক !

কড়া নাড়ার শেষ নেই, এবার গলা পাওয়া গেল, কি রে মায়েরা এক মুঠো চাল দে' রে, আর একটু মুড়ি, কপালে কিচ্ছু জোটেনি আজ !

হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল, টোপা বাউল এসেছে।

– যা, এক মুঠো চাল আর একটু মুড়ি দিয়ে ওকে বিদেয় কর, আবার কোনোমতে দম নিতে নিতে সন্তোষ বলে। শ্রাবণী উঠে গেল আর চৈতি বাবার বুকে মালিশ করতে লাগল।

ঘর থেকে শোনা গেল, দরজা খোলার আওয়াজ। ঘর থেকে শোনা গেল ওদের কথাবার্তা ।

– না রে মা, গান না শুনিয়ে ভিক্ষে আমি নিই না . . . আমি কি ওদের মতো ওই বাউন্ডুলে ভিখিরি নাকি? আমি জাত বাউল . . .

শ্রাবণী উত্তরে কী বলল, ঘরের ভেতর থেকে ঠিক শোনা গেল না ।

ঘরের মধ্যে কাঁটা হয়ে বসে আছে চৈতি আর সন্তোষ। বিশের বিষে এই বৈশাখ মাসেও চৈতির গা দিয়ে এক হাড় কাঁপানো শিরশিরে ঠান্ডা বাতাস বয়ে গেল। একটু মুখ বাড়িয়ে দেখলো শ্রাবণী হতাশ মুখে দালানের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে। আর আধ অন্ধকার ঘরে বাবাকে কোনো রকমে চেপে ধরে কাঁটা হয়ে বসে আছে চৈতি।

আবার শ্বাসের কষ্ট হচ্ছে, মুখে কাপড় দিয়ে কাশি থামাতে চোখ দুটো উল্টে গেল সন্তোষের। চৈতি কোনোরকমে বাবাকে জাপটে ধরে বুকে গলায় হাত বোলাচ্ছে ... অস্থির হয়ে ফিসফিস করে বলল, বাবা ও বাবা, একটু জল খাবে গো ? কোনো স্বর বেরোলো না সন্তোষের মুখ থেকে, শুধু একটা গোঙ্গানি।

মাথাটা চৈতির কাঁধে ঢলে যাচ্ছে, একটু একটু করে ... ।

দালানে দাঁড়িয়ে তখন টোপা বাউল একতারায় ধুন ধরেছে, তারপর গলা ছেড়ে গাইল –

"খাঁচার ভিতর অচিন পাখি ক্যামনে আসে যায়
তারে ধরতে পারলে মন বেড়ি, ধরতে পারলে মন বেড়ি দিতাম পাখির পায়ে" ....

সুমিতা বসু – বর্তমানে হিউস্টন টেক্সাস-এ বাস। এর আগে বস্টনে কেটেছে দুই দশকেরও বেশি। বিদেশে কেটে গেল বহু বছর আর নিত্যদিনের কাজের সূত্রে সম্পূর্ণ অন্য অভিজ্ঞতা হলেও, মনের ভেতর নাড়া দেয় মাতৃভাষা। তাই নিয়মিত সাহিত্য চর্চা বাংলাতেই। ছোটগল্প, কবিতা আর প্রবন্ধ – স্বচ্ছন্দ বিচরণ। বেশ কিছু বইয়ের সম্পাদনার কাজও করেছেন, অনেকদিন বই প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত ।

রমা সিনহা বড়াল

সৌরমন্ডলের কথা

চাঁদমামা

"আয় আয় চাঁদা মামা, সোনার কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা" – একসময় বাংলার ঘরে ঘরে এই ছড়ার প্রচলন ছিল। বাচ্চার চোখে কাজল পরিয়ে , কপালে একটা গোল বড়ো কাজলের টিপ দিয়ে, তখনকার মায়েরা তাদের আদরের ধন কে এই ছড়া বলে আদর করতো। অথবা "চাঁদের বুড়িমার চরকা দিয়ে সূতো কাটা" নিয়ে ও রূপকথা গল্পের প্রচলন ছিল। তবে সে ছিল ষাট সত্তর দশকের কাহিনী। আজকের এই বিংশ শতাব্দীর প্রজন্মের শিশুরা, ভারত মায়ের গৌরব "ইসরোর" সৃষ্টি "বিক্রম ল্যান্ডার" এর চাঁদমামার বাড়ি পৌঁছানো, দেখে বড়ো হচ্ছে। রূপকথার চাঁদ ছেড়ে বাস্তব চাঁদের রহস্য জানতে পারছে। চাঁদমামার বাড়ি থেকে কি মণি মুক্তো, বিক্রম তার ধরিত্রী মায়ের জন্য পাঠায় তাই এখন দেখার ও জানার বিষয়।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে ২০২৩ সালের ১৪ই জুলাই এক বিশেষ দিন। ভারতীয় সময় দুপুর ২:৩৫ মিনিটে, শ্রীহরিকোটার রকেট লঞ্চ সাইটে প্রচুর ভীড়। এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত, চন্দ্রায়ন ৩ যাত্রা শুরুর শুভ লগ্ন উপস্থিত। ঠিক ২:৩৫ মিনিটে এ রকেট চাঁদের উদ্দেশে পাড়ি দিল। ক্রমশ অতিক্রম করলো পৃথিবীর বায়ুমন্ডল স্তর। চাঁদের মাটিতে বিক্রম পা রাখলো ২৩শে আগষ্ট আমাদের পৃথিবীর উপরের বায়ুমণ্ডলের স্তর আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল হল গ্যাসের স্তর, যা সম্মিলিতভাবে বায়ু নামে পরিচিত, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা ধরে রাখা হয়।

উষ্ণতা তারতম্যের উপর ভিত্তি করে বায়ুমণ্ডল কে ছটি স্তরে ভাগ করা হয় যেগুলি হলো ট্রপোস্ফিয়ার, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার, মেসোস্ফিয়ার, থার্মোস্ফিয়ার, এক্সোস্ফিয়ার এবং ম্যাগনেটোস্ফিয়ার।

বায়ুমণ্ডলের গঠন

ট্রপোমণ্ডল: ভূপৃষ্ঠ থেকে ১২/১৮ কিলোমিটার (০ থেকে ৭/৯ মাইল)

স্ট্র্যাটোমণ্ডল: ১২/১৫ থেকে ৫০ কিলোমিটার (৭/৯ থেকে ৩১ মাইল)

মেসোমণ্ডল: ৫০ থেকে ৮০ কিলোমিটার (৩১ থেকে ৫০ মাইল)

তাপমণ্ডলঃ ৮০ থেকে ৭০০ কিলোমিটার (৫০ থেকে ৪৪০ মাইল)

এক্সোমণ্ডল: > ৭০০ কিলোমিটার (>৪৪০ মাইল)

ম্যাগনেটোমণ্ডল: অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের এই স্তরের দুটি নাম রয়েছে, যেমন - থার্মোস্ফিয়ার ও আয়নোস্ফিয়ার । তবে এই স্তরটি আয়োনোস্ফিয়ার নামেই বেশি পরিচিত ।

আমাদের সৌরমন্ডলের অন্যান্য গ্রহ কে চেনার ও জানার যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে, সেই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বহুদিন আগেই আমাদের বায়ুমণ্ডলের বিষয়ে গবেষণার কাজ বৈজ্ঞানিকরা করে চলেছেন। অন্য গ্রহে যেতে গেলে রকেটকে এই আয়নোস্ফিয়ার স্তর পার হয়ে যেতে হয়। তাই এর বিষয়ে গবেষণা জরুরী ছিল। বিশেষ করে এই স্তরের মধ্যে দিয়ে (বেতার তরঙ্গের গতিবিধি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন অধ্যাপক শিশির কুমার মিত্র।)

তাঁর এই গবেষণা, পরবর্তীকালে মহাকাশ গবেষণার কাজে অনেক সাহায্য করে। আজ তাই তাঁর প্রতি সম্মান জানিয়ে ইসরো চাঁদের crater এর নাম রেখেছে "মিত্র"।

(Mitra is a lunar impact crater that is attached to the western outer rim of the larger crater Mach, on the far side of the Moon. Just to the west of Mitra is Bredikhin, and to the south-southeast lies Henyey.)

কলকাতার রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ এর রেডিও ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট এর সৃষ্টিকর্তাকে ইসরো এভাবে সম্মানিত করায় আমরা গর্বিত। এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলবার খুব ইচ্ছা হচ্ছে। আমাদের বাবা এবং অসংখ্য ছাত্র ছাত্রীদের প্রিয় মাস্টারমশাই প্রফেসর ডঃ শঙ্কর সেবক বড়াল ছিলেন এই বিখ্যাত ফিজিক্স এর মাস্টারমশাই এর একজন প্রিয় ছাত্র। তাঁর ডি.এস.সি থিসিস গাইড ছিলেন প্রফেসর শিশির কুমার মিত্র এবং বিষয় ছিল "আয়নোস্ফিয়ার এর উপর বেতার তরঙ্গের প্রভাব"। ১৯৫৪ সালে ডঃ বড়াল ডি.এস.সি উপাধি লাভ করেন। সেই সময় গবেষণার কাজে ব্যবহৃত ভালব সেট রেডিও আজও আমাদের বাড়ি সযত্নে রাখা আছে।

শুধু তাই নয় চন্দ্রায়ন ৩, এর এই সাফল্যের পিছনে আমাদের কলেজের ইলেকট্রনিক্স ও ইলেকট্রিক বিভাগের চারজন কৃতি প্রাক্তনীর অবদানও আমাদের গর্বিত করেছে। তাঁরা হলেন সুমিতেশ সরকার ই.টি.সি '৮৭, দেবজ্যোতি ধর ই.টি.সি '৮৭, রিতু নাথ ই.ই '৯৫ এবং জয়ন্ত লাহা ই.টি.সি '২০০৯। এঁদের সবাই কে তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য ও কাজের সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানাই।

রেডিও তরঙ্গের ব্যবহার পরবর্তীকালে পথ দেখিয়েছে প্লাজমা তরঙ্গের ব্যবহারকে। পৃথিবীর মতো বায়ুমণ্ডল চাঁদে নেই, যেখানে শব্দ সঞ্চালনের জন্য রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার করা যায়। কিন্তু বিক্রম ল্যান্ডারের পরীক্ষার ফল হিসাবে প্লাজমা তরঙ্গের সাহায্যে চাঁদে কিছু অদ্ভুত শব্দ তরঙ্গের উপস্থিতি জানতে পারা গেছে। বৈজ্ঞানিকরা তা পরীক্ষা করবেন। আমরা সাধারণ মানুষ কি এটা কল্পনা করতে পারি যে চাঁদে উপস্থিত কোন অদৃশ্য প্রাণী এই শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষ কে কিছু বলতে চাইছে ?

চাঁদের সাউথ পোল, যেদিকে বিক্রম নেমেছে সেদিক প্রচন্ড ঠান্ডা -২৩৫ ডিগ্রী সেখানকার তাপমাত্রা। অপরদিকে অপর গোলার্ধ সাংঘাতিক গরম, ৫৪ ডিগ্রী সেখানের তাপমাত্রা।

বিক্রম ল্যান্ডারের পাঠানো নানা তথ্যের উপর নির্ভর করে ইসরোর বিজ্ঞানীরা নানা বিশ্লেষণ করছেন। চাঁদের এই প্রচন্ড ঠান্ডা পরিবেশে জলের অস্তিত্ব আছে বলে মনে করা হচ্ছে। আজ চন্দ্র অভিযানে, মহাকাশ ও মহাজাগতিক গবেষণার কাজে আমেরিকার নাসা, রাশিয়া, জাপান সব দেশই সামিল আছে। সকলের এই মিলিত প্রয়াস ও গবেষণা এক নতুন দিগন্তের সূচনা করবে। হয়তো বা এই দূষিত পরিবেশ, সমস্যা জর্জরিত বুড়ো পৃথিবী ছেড়ে নতুন কোন পৃথিবীর মতো গ্রহের সন্ধান পাওয়া যাবে যেখানে মানুষ বসবাস করতে যাবে।

এই লেখা লিখতে লিখতে মনে হলো টেকনিক্যাল না করে এটা যদি কল্প বিজ্ঞান কাহিনী হিসাবে লিখি কেমন হয়? চাঁদমামাকে বাসস্থান হিসাবে যোগ্য করে তোলার জন্য নানা দেশ না না ভাবে চেষ্টা করে চলেছে, বিশেষ করে আমেরিকার নাসার বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে নানা গবেষণা করছেন। চাঁদের ধুলো ব্যবহার করে সেখানকার রাস্তাঘাট, বাড়ি তৈরী করবে। শুনেছি ইসরো এবার চাঁদে মানুষ পাঠাবার কথা ভাবছে। সেখানে মহাকাশ গবেষণার জন্য রকেট লঞ্চ করার কেন্দ্র তৈরির ব্যবস্থা করবে। এই সব কাজ artificial intelligent বা রোবট দিয়ে করা হবে। যে ভাবে বিক্রম ল্যান্ডারকে পৃথিবী থেকে চালনা করে চন্দ্রোজয় করা হয়েছে, সেভাবে আমরা শহর বা নগর পরিকল্পনার কথা ভাবতে পারি। সেখানকার বাড়ি ঘর, রাস্তাঘাট, যানবাহন, চাঁদের পরিবেশ অনুযায়ী তৈরী হবে। কাজটা করবে পৃথিবীর

থেকে পাঠানো আলফা, বিটা, গামা ইত্যাদি রোবটেরা। যাদের প্রোগ্রামিং ওইভাবে করা থাকবে। এই কাজে সব মহাদেশের বিজ্ঞানীদের অবদান থাকবে।

প্রকৃতির নিয়মে একদিন চাঁদের অন্ধকার ঠান্ডা দিকে যখন সূর্যের আলো এসে পড়লো, সেদিক উত্তপ্ত হতে শুরু করলো, ক্রেটার এর ভিতর থেকে লম্বা এনটেনা লাগানো একমাত্রিক চাঁদের রোবট রা আত্মপ্রকাশ করলো।

তাদের সাংকেতিক ভাষার তর্জমা করে জানা গেল তাদের নাম আমাদের বৃহন্তরোণ্যক উপনিষদ বর্ণিত সপ্তঋষির নামানুসারে। তারা হল অত্রি, ভরদ্বাজ, গৌতমা, জামদাগ্নী, কাশ্যপ, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র। বিক্রম ল্যান্ডার মুগ্ধ বিস্ময়ে ভারতবর্ষের পূর্ব পুরুষদের নামে নামাঙ্কিত এই রোবটদের পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। শব্দের ভাষা আদান প্রদানের মধ্যে দিয়ে তারা পৃথিবীর অতিথিদের স্বাগত জানাল। আমন্ত্রণ জানাল তাদের বাসস্থান গ্রহ ঘুরে দেখার। আলফা, বিটা, গামা পৃথিবীতে তাদের পরিচালক গবেষক দের কাছে অনুমতির জন্য অনুরোধ জানাল। অনুমোদন হতে সপ্তর্ষি প্রথমেই তাদের মাটির নীচের সুবৃহৎ অত্যাধুনিক গবেষণাগারে নিয়ে গেল। দেখা গেল অসংখ্য রোবট নিঃশব্দে অত্যাধুনিক কম্পিউটার নিয়ে কাজ করছে। জানা গেল মহাবিশ্বের মহাকাশে মহাকালের মাঝে যে বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে তারা তারই গবেষণার কাজে ব্যস্ত। তারা পরীক্ষা করে জানতে পেরেছে এই বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের কয়েক শতকোটি আলোকবর্ষ দূরে আরো কয়েকটি সৌরমন্ডলের অস্তিত্ব আছে। এক একটি গ্রহের সাথে আরো কিছু গ্রহ আগুনের গোলা মতো বিশাল সূর্য কে প্রদক্ষিণ করছে ও সেই সূর্যের আলোয় আলোকিত হচ্ছে ও বেঁচে থাকার রসদ জোগাড় করছে।

বহুদূর গ্রহ থেকে আগত শব্দ তরঙ্গ তাদের পরীক্ষাগারে তাদের ভাষায় অনুবাদ করে জানাচ্ছে, বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের বাকি অধিবাসীদের সাথে তারা সংযোগ স্থাপন করতে চায়। তাদের গলার স্বর একটু ভিন্ন রকমের। সবচেয়ে অবাক কান্ড তাদের নাম ঋক বেদ ও সাম বেদে বর্ণিত মহান সাধিকাদের নামে। তাঁরা হলেন সাধিকা গার্গী, মৈত্রেয়ী, রোমাশা, লোপামুদ্রা, অপালা কদ্রু, বিশ্বশ্রবা, ঘোষা, জুহু, বাগাম্বারিনী, পৌলমী, যামু, ইন্দ্রাণী, সাবিত্রী, দেবযানী। এঁরা সবাই মহিলা রোবট গবেষক। এই গ্রহকে সববিষয়ে পরিচালনা করেন এই মহিলা রোবটের দল। এঁদের সাফল্যের পিছনে আছেন তাঁদের সাধিকা শিক্ষিকারা। তাঁরা হলেন বিশ্বশ্রবা, লোপামুদ্রা, অপালা, উর্ব্বশী, সুলবা, লীলাবতী, মৈত্রেয়ী, শাশ্বত, ক্ষণা, গার্গী। এই গ্রহের সৃষ্টিকর্তী এই মহিলা রোবট বাহিনী।

চাঁদ ও অন্যান্য গ্রহগুলির থেকে তাদের গ্রহের দূরত্ব বহু আলোকবর্ষ দূরে, তার জন্য তাদের গ্রহে পৌঁছতে হলে কিছু মহাকাশ স্টেশন এর প্রয়োজন। তাই মহিলা গ্রহের গবেষকরা একশকোটি আলোকবর্ষ দূরে দূরে একটি করে অত্যাধুনিক মহাকাশ স্টেশন তৈরির কাজ করেছে। মহাকাশ স্টেশন চারিদিক স্বচ্ছ পদার্থ দিয়ে ঘেরা। স্টেশন এর মধ্যে দিয়েই মহাকাশ এর মহাজাগতিক রূপ দেখা যায়। নানা রংএর তারকা খচিত বিশাল মহাকাশের অপরূপ দৃশ্য মুগ্ধ করে সবাই কে।

প্রত্যেক মহাকাশ স্টেশন পরিচালিত হয় এই সাধিকা রোবট দ্বারা। মহাশূন্যের মাঝে বিচরণ এর জন্য এরা অদ্ভুত ধরনের যান ব্যবহার করে। সেগুলি সোলার পাওয়ার এ চলে। যে শব্দ তরঙ্গের সাহায্য নিয়ে ভাষার আদান প্রদান হয় তাও মহাবিশ্ব মন্ডলের প্রাকৃতিক সম্পদের সাহায্যে সৃষ্টি। রোবটগুলি এমনভাবে তৈরি যাতে তারা বুঝতে পারে, তাদের কি ভাবে ব্যবহার করা হলে গ্রহে অবস্থিত অন্য প্রাণের ক্ষতি হতে পারে। তখন তারা নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে না। সাধিকা মৈত্রেয়ী তাই বিক্রম ল্যান্ডার কে জানালেন আমাদের সৌরমন্ডলের দূত খুব শীঘ্রই তোমাদের পৃথিবীতে এই শিক্ষার প্রচারে যাবে, যাতে ধ্বংসের কবলে থাকা পৃথিবী মুক্তি পায়। ধরিত্রীমায়ের কাছে চাঁদমামার এইহবে ভাতৃদ্বিতীয়ার উপহার। আর কিছুদিনের মধ্যেই পৃথিবীর অক্সিজেনের ভান্ডার শূন্য হয়ে যাবে, রোবট মৈত্রেয়ী তার দূরদৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পারে। তাই তার প্রিয় রোবট লোপামুদ্রাকে ইউ এফ ও আকাশ যান নিয়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল শুদ্ধকরণের জন্য পৃথিবীতে পাঠাবে মনস্হ করলো। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ সে ব্যাপারে আগাম কিছু না জানলে

লোপামুদ্রার ক্ষতি হতে পারে তাই শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করে মৈত্রেয়ী বিক্রম ল্যান্ডারকে পৃথিবীর ইসরোর গবেষকদের, তরঙ্গের মাধ্যমে জানিয়ে রাখতে বললেন। পৃথিবীতে এই বার্তা পৌঁছতেই সুযোগ সন্ধানী কিছু মানুষ প্রচার করতে লাগল ভিন্ন গ্রহের প্রাণীরা পৃথিবীকে ধ্বংস করতে আসছে। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মৈত্রেয়ী জানতেন এরকম ঘটনা ঘটতে পারে। তাই তার "সুস্হ পৃথিবী মিশনে" যাত্রা শুরুর আগে সব রকমের সাবধানতার ব্যবস্হা করলেন। আমরা পৃথিবীর মানুষ, এখন তাই ভিন্ন গ্রহের দয়ায় "সুস্হ পৃথিবীতেই সুস্হভাবে বেঁচে থাকার" জন্য অপেক্ষা করে আছি।

রমা সিনহা বড়াল – পেশায় স্থপতি ও নগর পরিকল্পনাবিদ। বি.ই. কলেজের স্থাপত্য বিভাগের স্নাতক ও খড়্গপুর আই. আই. টি নগর পরিকল্পনাবিভাগের স্নাতকোত্তর। "কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি" র নগরোন্নয়ন বিভাগে পরিকল্পনাবিদ হিসাবে কর্মরত ছিলাম। বর্তমানে ঐ বিভাগের "এডিশানাল ডিরেকটর" হিসাবে অবসর গ্রহণ করেছি। অবসর সময় নানা ই-ম্যাগাজিনে কর্মজীবনে নিজের অভিজ্ঞতার গল্প লিখতে ভালবাসি। ছোটবেলায় বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ক্যাম্পাসের সুন্দর পরিবেশে বড় হয়েছি। বাবা ছিলেন স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ প্রফেসর শঙ্কর সেবক বড়াল। তাঁর ও আমার দিদি, দাদার উৎসাহে বিজ্ঞান ভিত্তিক কল্প কাহিনী লিখতে ভালবাসতাম। আজ আমার একসাথে বড়ো হওয়া, ছোটবেলার প্রিয়বন্ধু,অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী নূপুর (অনুশ্রী) এর উৎসাহে, বিজ্ঞান ভিত্তিক কল্প কাহিনী "জেমস ওয়েব এর টেলিস্কোপ", বাতায়ণের মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে পেশ করলাম।

দেবব্রত তরফদার

ব্যতিক্রমী

ফজর আলীর জন্ম মোরগ ডাকা ভোরে। বিকেল থেকে তার মা আসমানতারার প্রসব বেদনা ওঠে। শহর সন্নিকট গ্রাম জালালখালীতে আসমানতারার বাপের ভিটে। এই গ্রামের অনেকেই এখনো প্রসবের ব্যাপারে ধাইমার উপরই নির্ভরশীল কিন্তু বেদনা ওঠার দু ঘন্টার মধ্যে কিছু না ঘটায় আসমানের বাপ হেকমত শেখ আর ধাইমার উপর ভরসা করতে না পেরে ঘোড়ার গাড়ি করে সোজা মাতৃসদন। ডাক্তার নার্সদের কাছ থেকে একচোট গালাগাল শুনতে হয়। মেয়ের বিয়ে দিয়েছে কৃষ্ণনগরেই রাজবাড়ীর পাশে গড়ে। তা জামাই শুকুর আর তার বাপ বশিরআলী দুজনেই ঘোড়ার গাড়ি চালায়। নিজের বাড়ি ঘরদোর আছে, আয় পয় খারাপ নয়। জামাই বাড়ি খবর যেতেই বেয়াই বেয়ান চলে আসে হাসপাতালে। জামাই শুকুরআলী আসেনি। বউ বিয়োতে এসেছে আর তার স্বামী এসে বসে থাকবে এ বড়ো লজ্জার ব্যাপার। শুকুরের আম্মা সাকিরুন বিবি একটু থেকেই ভাতপানি করতে বাড়ি চলে গেল রাতে মেহমানদের খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার আছে। যাওয়ার সময় বেয়ান আয়েশাবিবিকে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে যায়। দুই বেয়াই থাকে হাসপাতালের গাছতলায় বসে থাকে। রাত আটটার সময়ও কোনো খবর নেই, শুকুর তার বন্ধু প্রকাশকে নিয়ে হাসপাতালে গেলে দুই বেয়াই বাড়ি আসে। কারো খাবার মতো অবস্থা ছিল না। একটু ভাত নাড়াচাড়া করে দুই বেয়াই উঠে পড়ে, রাতজাগা রয়েছে। তবে শুকুর আর প্রকাশ দুই বুড়োকে রাতজাগা থেকে রেহাই দেয়। ওরা খেয়ে গিয়ে বসে হাসপাতাল চত্তরে, সাকিরুন আর আয়েশা অবশ্য তাদের সঙ্গ ছাড়েনি। প্রকাশ ছিল যথেষ্ট করিতকর্মা, আবার হাসপাতালের জেনারেটর অপারেটর ছেলেটা তার পরিচিত হওয়ায় ভেতরের খবর পাওয়া যাচ্ছিল সবসময়। পেশেন্টকে স্যালাইন দিয়ে রেখেছে আপাতত। রাত তিনটের সময় যখন লেবাররুমে নিয়ে গেল তখন আসমানতারা একেবারে নেতিয়ে পড়েছে, চোখদুটো একেবারে ঘোলাটে।

শুকুরআলী বউয়ের অবস্থা দেখে একেবারে দমে যায়। গাছতলায় বসে সেই সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করে আর ভাবে কোন ফেরেস্তা এসে সেই সুখবরটি দেবে। প্রকাশ শুকুরের জিগরী দোস্ত সেই হাফপ্যান্ট বেলা থেকে। মিউনিসিপ্যালিটির ক্যাজুয়াল কর্মী আর একটা খাতাপেনের দোকান আছে, বাপ ছেলে মিলে চালায়। সব ব্যাপারেই কোচোয়ান বন্ধুটির পাশে আছে। সাকিরুনের সে আর একটি বেটা, দুজনেই রাত জাগে। বন্ধুর কাঁধে হাত দিয়ে বসে আছে পরম মমতায়। বয়স্ক দুই মহিলা একটু দূরে বসে, আল্লাকে ডাকা ছাড়া কোনো পথ নেই। কদিন পরে বোধহয় পুজো, পাশেই জাগৃতি ক্লাবের প্যান্ডেলের কাজ হচ্ছে রাত জেগে। চারদিক একটু ফর্সা হয়ে আসছে, শান্ত ভোরে কোথাও থেকে ভেসে আসছে ঢাকের শব্দ। এরই মধ্যে নলুয়া পাড়ার কোন মুসলিম বাড়ি থেকে ভোরের জানান দেয় কোন মোরগ। আর এই সময়েই নার্সদিদি এসে জিজ্ঞেস করে আসমানতারার বাড়ির লোক আছে কিনা। ভোর চারটে পাঁচ মিনিটে সে জন্ম দিল ফুটফুটে একটি শিশুর। ফেরেস্তা জিব্রাইল যেন নার্সদিদির রূপ ধারণ করে এসেছে। চারজন পড়িমরি করে ছোটে। ট্রের উপর আল্লার রসূলটি হাত পা ছোড়ে। নরমাল ডেলিভারি, ক্লান্ত অবসন্ন আসমানতারার মুখে অপার্থিব হাসি। সে স্বামীর দিকে তাকায়, শাশুড়িমা, প্রকাশ ভাইয়ার সামনে মাথায় ঘোমটা নেই, সে হঠাৎ লজ্জা পায়।

প্রকাশ আর শুকুর বাইরে আসে।

প্রকাশ বলে – বোধহয় শুভক্ষণেই জন্ম হলো তোর ছেলের, দেখিস একটা কেউকেটা হবে তোর ব্যাটা।

শুকুর হাসে, এখন ফজরের নামাজের সময়, প্রকাশ একটু দূরে দাঁড়ায়। হাসপাতালের শিউলি গাছের নিচটা ফুলে ফুলে সাদা, ফুলের বিছানা শুকুরের জায়নামাজের কাজ করে। ফজরের নামাজে বসে শুকুর, তার মাথায় ঝরে পড়ে শিউলি, আকাশে ফেরেস্তাদের জমায়েত। চারদিক আলো করে জন্ম হলো ফজরআলীর।

ফজর বড়ো হয়, কালো রোগা চেহারা, দাদা বশিরের মত রঙ পেয়েছে, তেল মাখাতে মাখাতে সাকিরুন গজ গজ করে, কিন্তু চোখনাক মায়ের মতো সুন্দর। পা পা হাঁটতে শেখে, একদমই দুরন্ত নয়, কান্নার শব্দ শোনা যায় না, বাড়িতে একটা বাচ্চা আছে বোঝা যায় না। ফজর স্কুলে ভর্তি হয়। তার ছুন্নত দেওয়া হয় ধুমধাম করে। ট্রলি ভ্যানের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ঘোড়ার গাড়ির সংখ্যা কমতে থাকে, পরিবারের আয় কমে যায়। এখন আর একটি ঘোড়াও নেই। শুকুর ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে ধরে নবদ্বীপ ঘাট কৃষ্ণনগর স্টেশনের একটি অটো পারমিট বার করে একখানা অটো নামিয়েছে। আর তার আব্বা জালালখালীর বেয়াই এর সঙ্গে সবজির ব্যবসা করে। এইসব করেই চলে যাচ্ছে কোনরকমে।

ফজরআলী ভর্তি হয়েছে এ ভি স্কুলের প্রাথমিক বিভাগে। লেখাপড়ায় মোটামুটি, পাশ করে যাচ্ছে। কিন্তু তার হাতের লেখা দুর্দান্ত আর ছবিও আঁকে দারুন। বই এর ছবিগুলি খাতায় আঁকে সেই শিশুবিভাগ থেকেই। একটু দূরেই আঁকার শিক্ষক আছেন রুস্তম স্যার, তাদের ক্লাসের অনেকেই শেখে। ফজর মায়ের কাছে বায়না ধরে, সে আঁকা শিখতে চায়। আর শুকুরআলী ভর্তি করে দেয় রুস্তম স্যারের কাছে। প্রতি রবিবার ক্লাস, একগাদা ছাত্রছাত্রীর মধ্যে নিজের ছেলেকে যেন খুঁজেই পায়না শুকুর। পরে দেখে এককোণে তন্ময় হয়ে আঁকছে কোনদিকেই খেয়াল নেই। রুস্তম স্যার বার বার তার খাতা চাইলে সেদিকে কানই নেই ফজরের। শুকুরই রেগে যায় ছেলের বেয়াদপিতে। সে বকে ওঠে। স্যার শুকুরকে ডেকে বলেন – বকিসনা শুকুর, তোর ঘরে বোধহয় জাত শিল্পী এসেছে। কিছুতেই খাতায় পেন্সিল ছোঁয়াতে দেবে না, শুধু বলবে, স্যার আপনি দেখিয়ে দিন আমি আঁকছি।

খালি সারাদিন আঁকাজোকা, পড়ায় মন নেই – শুকুর গজগজ করে।

কেন আঁকা খারাপ নাকি, তোর ছেলে দেখছি অনেককেই ছাপিয়ে যাবে, ওর যা সেন্স – স্যার বলেন।

আর তারপর টিউশন করে খেতে হবে সারাজীবন।

স্যার খোঁচাটা হজম করে বলেন – আমি তো আর্ট কলেজে চান্স পেয়ে পড়তে পারলাম না।

আর আমার মতো অটোচালক কি করে পড়াবে – শুকুরের দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

ক্লাস থ্রী তে স্কুলের প্রাথমিক বিভাগের অঙ্কন প্রতিযোগিতায় ফজরআলী ফার্স্ট হয়। ছবিটি ছিল মা সরস্বতী হাঁসের পিঠে চেপে মেঘের দেশে পাড়ি দিয়েছেন। জাজমেন্টে যিনি ছিলেন তিনি শান্তিনিকেতনের ছাত্র, এবং ছবি দেখে তিনি মুগ্ধ, ছোট্ট শিশুটিকে দেখে বিশ্বাসই হয়না এটা ওর আঁকা। সরস্বতী পুজোতে ছবিগুলো টাঙানো ছিল মতামত লেখার খাতা ভরে যায় ফজরের প্রশংসায়।

এরই মধ্যে বশিরের সঙ্গে গন্ডগোল হয়ে যায় তার প্রতিবেশী চাচাতো ভাই ওসমানের সঙ্গে। সে বেচারিও ঘোড়ার গাড়ি চালাতো, ট্রলি ভ্যান চালু হওয়ায় তার ভাড়া কমে যায় আর এরই মধ্যে হঠাৎ তার ঘোড়াটি মারা যায়। বেসামাল হয়ে পড়ে ওসমান তার ছেলেপুলে নিয়ে। ঘোড়ার গাড়িটিও বিক্রি করতে পারেনা ক্রেতার অভাবে। ট্রলি ভাড়া নিয়ে চালাচ্ছে, বয়স বাড়ছে, প্রতিদিন ঠিকমতো ভাড়া হয়না। চরম ধর্মপ্রাণ মানুষটি শেষ বয়সে মদ ধরেছে। রাতে এসে গালাগালি করে, আর যেদিন সে বউয়ের উপর হাত তুললো সেদিন আর বশির ঠিক থাকতে পারেনি দু ঘা বসিয়ে দিল সামান্য ছোট চাচাতো ভাইকে। আর রাতের বেলায় খিস্তি গালাগালির ঝড় উঠলো। শুকুরও তার বাপকে বকাবকি করলো যথেষ্ট। এখন ব্যাপারটা থমথমে মেরে আছে। তবে ওসমানের সঙ্গে বাক্যালাপ নেই। মদটদ খেলে ঠেস মেরে কথা বলে।

এরই মধ্যে একটি বোন হয়েছে ফজরের, চার বছরের নাদিয়া সারা বাড়ি দৌড়ে বেড়ায়, ভীষণ চঞ্চল। বই টই ছেঁড়া বন্ধ হয়েছে, অনেক ছবিও নষ্ট করেছে ভাইয়ার। ফজর কিছুই বলে না বোনটিকে, খুব ভালোবাসে তাকে। তবে অনেকদিনই হল বোনটি তার মাকে কেড়ে নিয়েছে তার কাছ থেকে। বোন হবার পরে সে তার দাদা দাদির মাঝখানে

শোয়। এ নিয়ে তার একটু দুঃখ আছে কিন্তু অভিযোগ নেই। তবে শান্ত চুপচাপ ছেলেটির কিছু মনের কথা হয় তার দাদার সঙ্গে বিছানায়। বশির আলীকে অনেক কিছুই জিজ্ঞেস করে। যেমন ফেরেস্তারা রাতের আকাশে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু মানুষ তাদের দেখতে পায়না কেন? আবার কখনো তার প্রশ্ন – দাদা আল্লা কেমন দেখতে?

দাদা তল খুঁজে পায়না এই প্রশ্নের। বলে – ভাইজান আল্লা নিরাকার, তিনি সর্বশক্তিমান তিনিই সবাইকে সৃষ্টি করেছেন।

আমি আল্লার একটা ছবি আঁকবো, কিন্তু কোনো ছবি পাচ্ছি না।

সাকিরুনের বুক কেঁপে ওঠে, ইবলিশ ভর করেছে ছেলেটার উপর, নাতিকে বুকে টেনে বলে – ওকথা বলতে নেই ভাইজান, গুনাহ হবে।

কেন, বন্ধুদের বাড়িতে কতো ঠাকুরের ছবি কতো ঠাকুরের মূর্তি আর আমাদের বাড়িতে আল্লা লেখা একটা ফটো।

বশির এই ছোট্ট শিশুটিকে কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না।

ফজর বলেই চলে – আচ্ছা দাদা আল্লা কি শিবঠাকুরের মতো, আমি যতবারই আল্লার ছবির কথা ভাবি তখনই আমার বন্ধু প্রসূনদের ঘরে টাঙানো একটা শিবঠাকুরের মুখ মনে পড়ে। আচ্ছা দাদা আল্লা বড়ো না শিবঠাকুর?

সাকিরুন বিরক্ত হবার ভান করে বলে – তুই কি আমাদের ঘুমোতে দিবিনে, আয় কাছে সরে আয় মাথায় হাত বুলিয়ে দিই। কিন্তু তার বুক কাঁপে, আবার কোন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে হয়তো।

পরে আর একদিন মাকে বলে – আম্মা আমার বোনটা বড়ো হলে ঠিক সরস্বতী ঠাকুরের মতো হবে ।

তোকে কে বললো – মা একটু বিরক্ত ।

আমার তো তাই মনে হয়, স্কুলে যে ছবিটা আঁকলাম তার মুখটা তো নাদিয়ার মতোই।

আসমানতারা ভাবে, কি বলছে ইবলিশের বাচ্চাটা, বোনের মুখ আঁকে ঠাকুরের মুখের সঙ্গে। আল্লার কোপে পড়বে কি তার মেয়ে। দুমদাম বসিয়ে দেয় ঘা কতক, আর মার খেয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় ছেলেটা, কাঁদতেও ভুলে যায়। সাকিরুন বিবিও বুঝতে পারেনা ব্যাপারটা। আসমানতারা চিৎকার করেই চলে – মোচলমানের ছেলে ঠাকুরের ছবি আঁকে, সব্বনাশ হবে সংসারের।

কেন, রুস্তম চাচাও তো আঁকে – ফজর কাঁদতে কাঁদতে বলে।

রুস্তম চাচা শিখেছ, সে তো মোচলমানের জাত নয়, নামাজ পড়ে না, মসজিদ যায় না তাকে গুরু মেনেছ, আবার মুখে মুখে চোপা।

কেন অনেক মুসলমান শিল্পী তো ঠাকুরের ছবি আঁকে, চাচা আমাকে দেখিয়েছে – ফজর এবার মরিয়া।

দেখবি হারামজাদা, মুখে মুখে আবার কথা – সে হাত তোলে ছেলের উপর।

ফজর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খায়, তার দাদি ইশারায় তাকে চলে যেতে বলে, কিন্তু শান্ত ছেলেটির গোঁ ধরে বসে থাকে। ছোট্ট শিশুটিও মার রঙ্গিনী ভঙ্গি দেখে চুপচাপ, ভাইয়াকে মার খেতে দেখে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে।

দাঁড়া তোর আব্বা আসুক, তোর আটিস হওয়া ঘোচাচ্ছি।

দুপুরবেলা বাপছেলে বাড়ি ফিরে খেতে বসে। থমথমে ভাব দেখে বুঝতে পারে কিছু একটা হয়েছে। সব বৃত্তান্ত শুনে হাসে শুকুরআলী। সে চিরকাল হিন্দু বন্ধুদের সঙ্গে মিশেছে, প্রসাদ খেয়েছে, আনন্দ করেছে পুজোতে। ভাবে গ্রামের মেয়েছেলে, গ্রামে হিন্দু ছিল না মনের মধ্যে তার একগাদা সংস্কার। কিন্তু সংসারে অশান্তির ভয়ে মুখে কিছু বলে না। বলে তার বাপ বশির,

বৌমা রাগঝাল করোনা, ফজর নেহাত পোলাপান, রংতুলি নিয়ে একটু খেলা করে আর কি।

আসমানতারা শ্বশুরের মুখের উপর কিছু বলেনা, সেটা শোভন নয়। কিন্তু ফজরকে কাছে টানতেই সে দাদার কোলের মধ্যে কান্নায় ভেঙে পড়ে, – দাদা মা বলেছে আর আঁকতে দেবে না, রংতুলি সব উনুনে দেবে।

দূর বোকা এসব রাগের কথা, মার মাথা ঠান্ডা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে – বশির অভয় দেয় নাতিকে। তারপর একটু জোর গলায় বলে – গাছপালা ফুল পাখি আঁকো কিন্তু ঠাকুর দেবতার ছবি একেবারে বন্ধ। তার চোখ কিন্তু প্রশ্রয়ের হাসি হাসে।

ফজরের ক্লাস ফোর, তার বাড়ি থেকে একটু দূরে পালপাড়া এরই মধ্যে দুর্গাপুজোর আগে লুকিয়ে দেখে এসেছে পালদের ঠাকুর গড়া। নজর এড়ায় না কোনো খুঁটিনাটির। দুর্গাপুজো চলে যায়, কৃষ্ণনগরে এর কোনো ধুমধাম নেই। কালিপুজোও কেটে যায়, আর এরপরেই আসে কৃষ্ণনগরের সবচেয়ে বড় উৎসব জগদ্ধাত্রী পূজা। প্রতিটি বারোয়ারিতেই ঠাকুর বানানো হয়। এখানকার নুড়ি পাড়ার পুজোটি চারদিনের, দুর্গাপুজোর মতো। তাই এদের কাঠামো, বিচুলি বাধা একটু আগেই শুরু হয়। এই পাড়ার মাঠ ফজরদের খেলার জায়গা আর যেদিন থেকে পালমশাই ঢুকেছে সেদিন থেকেই খেলা বন্ধ। হঠাৎই কাঠামো বাধা দেখতে দেখতে শুভ বলে – চল আমরা একটা পুজো করি।

সবাই অবাক বলে কি ছেলেটা। তারপর সবাই উৎসাহ নিয়ে বসে একজায়গায়।

কমল বলে – অনেক খরচ ভাই, টাকা পাবো কোথায় ?

শুভ চরম উৎসাহী – কেন আমাদের পালমশাই আছে, সে ফজরের দিকে আঙ্গুল তোলে। কিরে পারবি না ভাই ?

ফজরের চোখে ঘোর, বলে কি এরা। সে ঘাড় কাত করে। তখনই বারোয়ারীর ফেলে দেওয়া কাবারি দড়ি বিচুলি কুড়িয়ে নেয়। চরম উত্তেজনা ফজরের, রাতে পড়াশোনা ডকে ওঠে। পরদিন থেকেই বড় ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে অন্য জায়গায় ছোট ঠাকুর গড়ে উঠতে থাকে। সিংহটি করার সময় একটু ঝামেলা হয়। অলোক পাল বেশ নামী শিল্পী সে বুঝতে পারে ছোটরা কিছু একটা করছে, তার একটু প্রশ্রয়ও থাকে। পরিত্যক্ত চুল, সিংহের কেশর চুমকির সাজ দিয়ে ফজরের জগদ্ধাত্রী সেজে ওঠে। পঞ্চমীর দিন চক্ষুদান করে অলোক পাল। সাজটাজ পরিয়ে বিদায় নেবার সময় হঠাৎ মনে হয় বাচ্চাগুলোর কথা। খোঁজ নিয়ে দেখে একটু দূরে শুভদের বাড়িতে বানানো হচ্ছে ঠাকুর, সেখানে গিয়ে অলোক পাল থ। কি করেছে বাচ্চারা, তার তৈরি ঠাকুরের ছোট সংস্করণ প্রায় নিখুঁতই বলা যায়। ছোট প্রতিমা বানাতে মুন্সিয়ানা লাগে, হাত পা আঙ্গুলের মাপ নিখুঁত।

কে বানিয়েছিস – অলোকের জিজ্ঞাস্য।

ও বানিয়েছে – শুভ ফজরকে দেখিয়ে দেয়।

নাম কিরে তোর ?

ফজরআলী।

অলোক আশ্চর্য হলেও মুখে প্রকাশ করেনা বাচ্চাটিকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বলে – তোর ইনাম, খোদার হাত আছে তোর মাথায়, তুই অনেকদূর যাবি।

পুরস্কারের পঞ্চাশ টাকায় তাদের পুজো উৎরে যায়। মায়ের শাড়ির প্যান্ডেল আর টুনি বাল্বে ঝোপের মধ্যে সেজে ওঠে তাদের প্রতিমা।

ফজর ভয়ে ভয়ে থাকে তাদের ছেলেমানুষি পথ চলতি অনেক দর্শনার্থীকে মুগ্ধ করেছে। মায়ের কানে পৌঁছলে মুশকিল। কিন্তু বুঝতে পারে বাপ দাদা সবাই জেনে গেছে।

শুক্রবার জুম্মার নামাজ পড়তে যায় ফজর তার বাপ দাদার সঙ্গে। নামাজ পড়ার পর খুতবা দেওয়া হয়, খুতবার অর্থ হল সমসাময়িক কোন বিষয় কোরানের আলোকে দিক নির্দেশিত করা। খুতবার পর জলিল, যে এখনকার উঠতি বড়লোক আগে টিকিট ব্ল্যাক করতো এখন জমি কেনাবেচার ব্যবসা করে, নিজেকে কেউকেটা ভাবে এবং কিছু চামচা পরিবেষ্টিত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। সে হঠাৎ বলে – ইমাম সাহেব আপনাকে একটা বিচার করতে হবে।

ইমাম সাহেব জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়।

আমাদের ধর্মে মূর্তি গড়া গুনাহ আর এই শুকুরেরছেলে ইবলিশের দোসর ঠাকুর তৈরি করে, পুজো করে। এর বিচার করুন।

শুকুরের ছেলে কোনটি – ইমামের জিজ্ঞাস্য। আর ছোট্ট শিশুটিকে দেখে অবাক হন। তারপর কাছে ডেকে আদর করে বলে – বাপজান তুমি ঠাকুর তৈরি করো ?

ফজর দাদার কাছে সরে আসে ভয়ে, হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ে।

বাপজান, আমাদের ধর্মে মূর্তি গড়া গুনাহ, তুমি আর ও সব করবে না।

পিছন থেকে তীক্ষ্ণ একটি চিৎকার আসে – ইমাম সাহেব বিচার ঠিক হলো না।

সবাই তাকিয়ে দেখে ট্রলিওয়ালা ওসমান, ফজরের বাবার চাচা, অনেকদিন বশিরের সঙ্গে কথা বন্ধ।

আপনি ওই ছোট্ট অবোধ শিশুকে কি বললেন, ওর পাপপুণ্য বোধ আছে। আমরা যে ট্রলিতে ঠাকুর বই, রাজমিস্ত্রি, রঙ মিস্ত্রীরা মন্দিরে কাজ করে তার বিচার করবে কোন খোদা। ইমাম সাহেব সবচেয়ে বড় ধর্ম পেট, খিদে পেলে সব ধর্ম ইয়ে দিয়ে বেরিয়ে যায়।

জলিল কিছু বলার জন্য উসখুস করতেই ওসমান মারমুখী – চুপ কর গু খেকোর ব্যাটা, আমার নাতিকে ইবলিশ বলিস, তুই যখন টিকিট ব্ল্যাক করতিস, যখন মদ খাস, মাগীবাড়ি যাস তখন গুনা হয়না, হাদিসে এইসব করতে বলেছে বোধহয়। আমার নাতিকে কিছুই বলে দ্যাখ মসজিদে রক্তপাত হবে। বেশ করবে ঠাকুর গড়বে, দেখি কি করে কোন বাপের ব্যাটা।

জোঁকের মুখে নুন পড়ার মত চুপসে যায় জলিল। তারপর ওসমান ইমাম সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলে – মাপ করবেন সাহেব, আমি মুখ্যু, মাতাল মানুষ নরকের কীট জানি মুসলিম মানে ইমানদার, মানুষ বাঁচার জন্য কিনা করে।

এগিয়ে আসে বশিরের দিকে – ভাইজান ক্ষমা করো মাতাল ভাইটিকে, অভাবী মানুষ মাথার ঠিক থাকে না। তবে নাতির হাতের কাজটি দেখেছ, এতটুকু ছেলে আল্লার রহমত না থাকলে এই কাজ করতে পারে।

তারপর ফজরকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে – দাদাজান খুব ভালো করে পড়াশোনা কর, আর ছবি আঁক, আল্লা তোমার সঙ্গে থাকুক।

বাড়ি ফেরার পথে বশির ওসমানকে বলে – হ্যাঁরে মাসুদ এখন কি করে ?

কি আর করবে, খায় দায় ঘুরে বেড়ায়, ব্যবসা করবে বলে টাকা চায়, কোথায় পাব বল ?

কালকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলিস সঙ্গে জোয়ান একটা ছেলে থাকলে ভালো হয় বেয়াই বলছিল তাহলে কলকাতা মার্কেটটা ধরা যাবে।

দুপুরে খেতে বসে বশিরের মনে হয় ঈদের মত খুশির দিন একটা।

ক্লাস সিক্সে ওঠে ফজর, রেজাল্ট তার ভালো হয়নি, আসমানতারা একটিও কথা বলেনা ছেলের সঙ্গে।

ফজর কি বলবে, পড়তে তার ভালো লাগে না। পড়তে বসলে তার ছবিতে পায়, খাতার পাশে লুকিয়ে আঁকে, বোনকে এটা ওটা বানিয়ে দেয়।

আসমানতারা একা একাই কাঁদে, তার একটাই ছেলে এত ভাল, ছোটবেলা থেকে কোনো যন্ত্রণা দেয়নি কিন্তু এখন কি হলো তার ছেলের।

ক্লাস সিক্সের সরস্বতী পুজোতে স্কুল সাজানোয় প্রধান ভূমিকা নিলো ফজর আর দু বছর পর স্কুল তাকে ঠাকুর করার দায়িত্ব দিয়ে সাহস দেখায়। খ্যাতনামা শিল্পীদের সঙ্গে টক্কর দিয়ে সান্তনা পুরস্কার পায় শহরে। প্রাইজের ট্রফি নিয়ে ফজর, বোনের হাতে দেয়। বাড়িতে খুশির আমেজ। ওসমান এসে বাড়ি সরগরম করে। শুভরাও এসেছে সব দল বেঁধে। আবদার করে আসমানতারার কাছে – মিষ্টি খাওয়াতে হবে কাকিমা।

নাদিয়া তার মাকে ট্রফিটা দেখাতে যায় – দেখ মা সরস্বতী ঠাকুরটা কি সুন্দর।

আসমানতারা হঠাৎ মারমুখী হয়ে ওঠে মেয়ের উপর – লেখাপড়া নেই তোর, প্রাইজে পেট ভরবে।

পরিবেশটা বেমানান হয়ে যায়, বাড়িটা ফাঁকা হয়ে যায়। শুকুরআলী বউকে বলে – ছেলেগুলো আবদার করেছিল, তুমি এমনটা নাও করতে পারতে, দেখতো মেয়েটা কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলল।

আসমানতারা বলে – তোমরা সবাই মিলে আমার ছেলেটাকে শেষ করছো। কি হবে তার ভবিষ্যতে। মোচলমানের ছেলে ঠাকুর গড়ে খাবে। দুবছর পর মাধ্যমিক দেবে, রেজাল্ট দিনদিন খারাপ হচ্ছে। সে নিয়ে তোমরা কিছু বলো না, আর এখন সবাই মাথায় তুলে নাচছো।

ফজর তার মায়ের দুঃখের কারণ বুঝতে পারে, মাঝে মাঝে তার মনে হয় সবকিছু ছেড়ে লেখাপড়ায় মন দেবে, কিন্তু তুলি ধরলেই সবকিছু ভুলে যায়।

পালপাড়ার সুবল পাল, মহেশ পাল তার ছেলেরা, কানাই ঘোষ, পরিমল পাল এইসব বিশিষ্ট শিল্পীরা তাকে সবাই চিনে গেছে। সে ঘুরে ঘুরে ওদের কাজ দেখে। সবচেয়ে ভালোবাসে তাকে অলোক জেঠু, সময় পেলে সে অলোক পালের কারখানায় হাতেপাতে একটু সাহায্য করে। এবার দুর্গাপুজোর অনেক কাজ অলোক পালের, বড়ো বড়ো কাজ বাইরের। দুমাস আগে থেকে অলোক পাল ফজরকে বলে – বাপ এবার একটু বেশি সময় দিতে হবে।

পারব না জেঠু, পড়া আছে স্যারেদের কাছে সেখানে কামাই হলে মা রাগ করবে, হয়তো বাড়ি থেকে বেরোতে দেবে না, আমি বিকেল বিকেল খেলার সময়গুলোতে আসব জেঠু।

ঠিক আছে বাপ তাই করিস।

ফজর সময় পেলেই ছুটেছে। মহালয়া পেরিয়ে গেল সব বড় ঠাকুরগুলো বেরিয়ে গেছে, কারখানা একদম ফাঁকা। এখন এলাকার ছোটখাট ঠাকুরগুলো রয়েছে। কদিন খুব ধকল যায় সবারই এখন একটু চাপ কম। চতুর্থীর দিন বিকেলবেলা হঠাৎই অলোক ডাকে ফজরকে – নে ব্যাটা তুলি ধর, পাড়ার ঠাকুরের চোখ দান কর।

ফজর কেঁপে ওঠে। অন্য কারিগররা একটু অবাক হয় মূল শিল্পী কখনো তুলি ছাড়ে না। বৃদ্ধ কারিগর ভোলা পাল কখনো দুর্গার চক্ষুদানের সুযোগ পায়নি। সে বলে – নে বাবা খোদার নাম করে শুরু করে দে।

ফজর প্রথমে ভোলা পালকে প্রণাম করে, তারপর অলোক পালকে। বুড়ো মানুষটি জড়িয়ে ধরে বাচ্চাটিকে। তুলিহাতে মাচায় চাপে ফজর, তার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। কতোদিন আম্মা তার সঙ্গে ঠিকমতো কথা বলে না, কতোদিন তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করেনি। বার বার চোখ মোছে। অলোক পাল অবাক হয়ে দেখে ছেলেটির চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। তুলির টানে মা জীবন্ত হন। কাজ শেষ হলে সবাই অবাকই হয়। মা বোধহয় এবার কথা বলবেন। অলোক পাল জড়িয়ে ধরে বাচ্চাটিকে। শিল্পীই শিল্পের প্রকৃত কদর করে।

অলোক জেঠুর কাছ থেকে কিছু টাকা পেয়েছে ফজর। দাদার হাতে দিয়েছে চুপিচুপি। দাদার সঙ্গে গিয়ে বোনের জন্য একটা জামা কিনেছে। মা আর দাদির জন্য শাড়ি। মাকে দিতে পারেনি। দাদির কাছে আছে। পাড়ার ঠাকুর এসে গেছে, ষষ্ঠীর ঢাক বাজতে শুরু করেছে। তার চক্ষুদানের ব্যাপারটি আর চাপা নেই। অনেকেই আলোচনা করছে। নাদিয়া তার দাদির সঙ্গে ঠাকুর দেখে এসে মাকে তার বর্ণনা দিয়েছে। আসমানতারা কিছু বলেনি। সপ্তমীর রাতে শুকুর তার বউকে বলে – চলো ছোঁড়াটা কি করেছে দেখেই আসি।

আসমানতারা নীরব, এই নীরবতাকেই সবচেয়ে ভয় পায় শুকুর। সাকিরুন এবার কথা বলে – বৌমা, তোমাকে মেয়ের চোখেই দেখি, বুড়ো মায়ের একটা অনুরোধ রাখ, নাতিটা আমার চোরের মত থাকে বাড়িতে, আমার বুক ভেঙ্গে যায়। কেঁদে ফেলে বুড়ি। তারপর নতুন কেনা শাড়িটা এগিয়ে দিয়ে বলে – এইটে পরো, তোমার ছেলের কামাই এর শাড়ি, আল্লার রহমত ভাব।

আসমানতারা একটু চুপ করে বসে উঠে গিয়ে শাড়িটা পরে, তার চোখ কি কাউকে খোঁজে? শুকুরের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। সে মুসলিমপ্রধান গ্রামের মেয়ে, পুজো হতনা তাদের গ্রামে, এখানকার মত ঠাকুর দেখার রেওয়াজ নেই। বিয়ের পর বেরিয়েছে স্বামীর সঙ্গে কিন্তু তেমন উৎসাহ নেই। মন্ডপে গিয়ে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে সে কেঁপে ওঠে, হারামজাদা করেছে কি ? মায়ের মুখের মধ্যে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়। পরিচিতরা তাকে দেখিয়ে অন্যদের বলে – ওই ফজরের মা। এক সমুদ্র কান্না তার বুকের মধ্যে আছড়ে পড়ে, তার চোখ ছেলেকে খোঁজে, কোথায় সে ? শুকুরকে বলে – আমি বাড়ি যাব, শরীরটা ভাল লাগছে না। নাদিয়া দাদির সঙ্গে থাকে। বাড়ি ফিরে দেখে বারান্দায় চুপচাপ বসে আছে ফজর। ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বাঁধভাঙা কান্নায় ভেঙে পড়ে আসমানতারা। কান্নার মধ্যেই বলে – তোকে আর আমি আটকে রাখতে পারব না, তুই শুধু আমার একার নস।

আর ফজর দেখে তারাভরা আকাশের মধ্যে দেবী দুর্গার মুখ, সে মুখ তার তার মায়ের মুখের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়।

(একটি চরিত্রও কাল্পনিক নয়, ছোট্ট আমিরের তৈরি জগদ্ধাত্রী ঠাকুর দেখেছিলাম তখন তার বয়স দশ বছর, আনন্দবাজার পত্রিকার কল্যানে দূরের লোকও তাকে চেনে, আমার সঙ্গে অবশ্য তার পরিচয় নেই কিন্তু তার খবর রাখি। এ বড়ো কঠিন সময়। কতোশত আমির আর ফজর সেতুবন্ধনের কাজ করে চলেছে। ঈশ্বর আর আল্লার আশীর্বাদ তাদের উপর বর্ষিত হোক)

কাজী লাবণ্য

ধূসর জোছনা

(১)

– আমরা যাচ্ছি কোথায় বলবি তো।

গাড়ি মিরপুর রোড ধরে ছুটে চলেছে। ঢাকা শহরে অবশ্য গাড়ি ছুটে চলে না, ধুঁকে ধুঁকে চলে। এই মুহূর্তে ছুটছে, রায়হানের মুখে কথা নেই। হাসি হাসি মুখ করে গাড়ি চালাচ্ছে। সায়েন্সল্যাবের সামনে এসে জ্যামে আটকে পড়ল গাড়ি। এবারে সে মুখ ফিরিয়ে বলল,

– শোন, ছয় বছর দুই মাস তেরদিন আগে আমি এই মেস ছেড়ে গেছি। ছয় বছর আগে তুই এই শার্ট গায়ে দিয়ে ঠিক এই টাইমে টিউশ্যনিতে যাইতি। তখন দুইটা করতি এখন কয়টা করিস জানি না, তবে আজও সেই টিউশ্যনিতে যাস। আর কত রে! আর কত এই টোকাইয়ের জীবন! এবারে নিজেকে বদলা।

– তা আমরা কি নিজেকে বদলাতেই যাচ্ছি ? জ্যাম ছুটে গেলে রায়হান উত্তর না দিয়ে স্টিয়ারিং হুইলে মনোযোগী হল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পরে আমার দিকে ফিরে বলল,

– শোন, ঘাওরামি করিস না। সময়ের ছাঁচে নিজেকে নরম ডোয়ের মত করে সাজাতে হয়। অপেক্ষা কিম্বা চেষ্টা তো কম করলি না। জীবন থেকে হারিয়ে গেল বছরের পর বছর। এবারে একটু নড়েচড়ে বোস। বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আয়। সবুজ ধূসর হয়েছে, মধ্য গগনের সূর্য হেলতে শুরু করেছে, স্বপ্ন ভেঙে গেছে আয় আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখি। নতুন করে বাঁচতে চেষ্টা করি, কেবল আমি যা বলি মন দিয়ে শুনবি। কিরে শুনবি তো!

ঘাড় ঘুরিয়ে পরিপূর্ণ চোখ ওর চোখে রেখে শ্রান্ত আমি বলি,

– হ্যাঁ শুনব।

– ওকে, চল এবার।

ঢাকা কলেজের উল্টোদিকে অবস্থিত বদরুদোজ্জা মার্কেটে ঢুকলাম। সেখান থেকে দেখে দেখে, বেছে বেছে কিছু শার্ট, ব্লেজার, জিন্সের প্যান্ট, আর টাই কেনা হল। কেনা হলো মানে রায়হানই কিনলো, প্যাকেটগুলো দুজনে মিলে হাতে নিয়ে বাইরে এসে গাড়িতে উঠে বসার পর সে ধানমন্ডির দিকে চলতে লাগল। একটি দামী রেস্তোঁরার সামনে এসে গাড়ি রাখল। উপরে গিয়ে আমরা একটা টেবিলে বসে পড়লাম।

– কি খাবি বল।

– যা খাওয়াবি। সে অর্ডার দিলে একটু পরেই চলে এলো ধোঁয়া ওড়া সুঘ্রাণযুক্ত বিরিয়ানি, রেজালা, চিকেন আর বোরহানি। আমার পছন্দের খাবারগুলোই বলেছে। অথচ রায়হান বোরহানি মুখেও দেয় না, ওর নাকি বমি পায় তবে বিরিয়ানি ওর খুব পছন্দের। এখন সে নিজের জন্য নিয়েছে মাশরুম স্যালাদ, চিকেন স্যুপ আর অরেঞ্জ জ্যুস।

– এটা কি হল! তুই খাবি না!

– না রে আমি আর ওসব খাই না। তুই খা। এইত আমি এগুলো খাচ্ছি।

– আজব তো, তুই খাবি না তো অর্ডার করলি কেন?

– তোকে খাওয়াব বলে। নে নে খেয়ে নে। তোকে নামিয়ে দিয়ে আমাকে আবার কাজে যেতে হবে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালে বলে,

– হ্যাঁ রাতেও কাজ থাকে।

ফিরতি পথে আর তেমন কথা হলো না। মেসের সামনে নামিয়ে দিয়ে কাপড়ের প্যাকেটগুলো আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল,

– পরশু সন্ধ্যা ঠিক ছয়টায় আমি আসব।

– পরশু?

– কেন নয়? শুভস্য শীঘ্রম অশুভস্য কালহরনং বুঝলি, তুই ভাল করে গোসল করে এই ড্রেস পরে রেডি থাকবি। ব্লেজার পরতে ভুলিস না। আমি তোকে কল দেব। তোর আগের ফোন নম্বরই তো আছে। বলেই হুশ করে বেরিয়ে গেল।

(২)

মনসুরাবাদ হাউজিং এর একটি মেসে আমরা বহুদিন ধরে থাকি। পাশ করে বেরুনোর পর থেকেই। সেসময় চোখের স্বপ্ন ছিল প্রগাঢ় সবুজ, ধমনির রক্তে ছিল তারুণ্যের প্রাবল্য। অটুট আত্মবিশ্বাসে টইটুম্বুর। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করেছি, এখন বিসিএস পরীক্ষা দেব আর সরকারী চাকরির বাড়ি, গাড়ি, পিওন, আর্দালি হাঁকাব। পরীক্ষা দিতে দিতে, সময়ের সাথে সাথে সেসব সবুজ ফিকে হতে হতে আজ ধূসর, ধূলট। স্বপ্ন আর স্বপ্ন নেই ভয়াবহ দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। বিসিএস পরীক্ষা দেবার বয়স পেরিয়ে গেছে। বেসরকারী কোন চাকরিও ধরা দেয়নি।

আমরা পাঁচ বন্ধু একসাথে এখানে এসেছিলাম। একে একে চারজন চলে গেছে। বিসিএস নামক বৈতরণী পারের চেষ্টায় জানবাজি রাখতে রাখতে বয়সসীমা পেরিয়ে গেছে। তবে ওই হিরার হরিণ আরিফের হাতে ধরা দিয়েছিল। আরিফ এখন বড় অফিসার। নিজের অফিসে সুদৃশ্য টেবিলের ওপাশে সটান বসে থাকে, শোনা যায় বেকার বন্ধুদেরকে সে এখন নাকি তেমন চিনতে পারে না।

শুভ'র বিসিএস হয়নি অন্যকিছু করতে না পেরে গ্রামে গিয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে টার্কি মুরগির চাষে মন দিয়েছে, শুনেছি সে খারাপ করছে না। রায়হান ব্যর্থতার গ্লানি ঢাকতে অজানায় চলে গেছে, কারো সাথে যোগাযোগ রাখে না। মোবাইল ফোনের সিমকার্ড পর্যন্ত পালটে ফেলেছে। আমি আর রুপম আছি। রুপম একটা এনজিওতে কাজ করছে। সদ্য ওকে লালমনিরহাটের এক গ্রামে বদলি করা হয়েছে। অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও সে গতরাতে চলে গেল।

সবাই চলে গেছে বলে মেস কিন্তু ফাঁকা নেই। দুর্ভাগারা সৌভাগ্যের চাবিটির লক্ষ্যে সিট ভরাতে ঠিক এসে জুটে যায়। যারা আছে তারা বলা চলে আমার অপরিচিত আর জুনিয়র।

একমাত্র বন্ধু, সঙ্গী রুপম চলে যাওয়াতে আমি বড্ড একা হয়ে গেলাম। বুঝিনি, এতটা খারাপ লাগবে। সারাদিন চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলাম। সন্ধ্যার ধূপছায়া আঁধার ছেয়ে যাচ্ছে এই মেসবাড়ি সহ চারপাশে। ঝাঁকে ঝাঁকে মহিলা মশককুল বেড়িয়ে পড়েছে তাদের রাগ সঙ্গীত আর ডেঙ্গুসহ নানা অসুখের জীবানু নিয়ে। টিউশনিতে যেতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু যেতে হবে। ছাত্রটির সামনে এসএসসি পরীক্ষা। উঠে কাপড় চেঞ্জ করে সিঁড়ি দিয়ে নামছি কানে এলো আমার নাম ধরে কে যেন কি বলছে নিচের সিকিউরিটির কাছে। কণ্ঠস্বর পরিচিত লাগছে, নিচে নেমে আমি নিজের চোখকে

বিশ্বাস করতে পারি না। রায়হান খোঁজ করছে আমি আছি কিনা। এত বছর পরে রায়হান আমার সামনে এটা অবিশ্বাস্য লাগছে তার চেয়েও অবিশ্বাস্য রায়হানের চাকচিক্যময় চেহারাসুরত। হাতের সিগারেট ছুঁড়ে দিয়ে কাছে এগিয়ে এলো,

– আজ তুই টিউশ্যনিতে যাচ্ছিস না। আমার সাথে যাবি...

– তুই! এতদিন কোথায় ছিলি! কোত্থেকে এলি!

– সেসব কথা পরে হবে। তুই আমার সাথে চল তো আগে।

– আমাকে টিউশ্যনিতে যেতে হবে তুই ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক আমি আসছি।

– আচ্ছা। জলদি ফিরবি কিন্তু। এই যে চাচা আমার গাড়িটা একটু দেখবেন। সিকিউরিটিকে বলে ঠোঁট গোল করে শিস দিতে দিতে সে সিঁড়ির দিকে এগুতে থাকে। রায়হানের গাড়ি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আমি হনহন করে হাঁটতে থাকি। ভাবতে থাকি রায়হান কার গাড়ি নিয়ে এসেছে ? নিজের নাকি ! তা কি করে সম্ভব ! কি জানি হতেও পারে। কত অবিশ্বাস্য ঘটনাই তো ঘটছে জগতে। রায়হানের হালচাল তাহলে পালটে গেছে। ওর তবে "দিন" ফিরেছে। ফিরুক ফিরুক বন্ধুদের "দিন" ফিরলে ভালই লাগে। আর রায়হান আমার ঘনিষ্ট বন্ধু। বাড়িতে ওর বাবা মা বোন ওর দিকে আশা নিয়ে চেয়ে থাকত। তাদের আশা হয়ত পূরণ হয়েছে।

কেবল কি ওরই?

আমারও বাবা নেই। বাড়িতে একা মা আর ছোট ভাই দুটি যাদের জন্য কখনই কিছু করতে পারিনি। বর্তমানে, ছোটটা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক পদের সবগুলো ধাপ একে একে পার করেছে। চাকুরির পাকা বন্দোবস্ত হবে যদি সে তিনলাখ টাকা দিতে পারে। অবশ্য আমাকে আর কেউ কিছু জানায় না। তবে শুনতে পাই। খুব ইচ্ছে করে, ওর চাকরির সর্বশেষ ধাপটা যদি পার করে দিতে পারতাম ... তিন লাখ ...

এরপরই রায়হান আমাকে নিয়ে বদরুদ্দোজা মার্কেটে শপিং করতে চলে যায়। বদরুদ্দোজা মার্কেট হলো সেই মার্কেট যেখানে গার্মেন্টসের রপ্তানী অযোগ্য ড্রেসগুলো অনেক সস্তায় বিকায়। সস্তা হলেও সেগুলো মানসম্মত, ফ্যাসানেবল এবং আরামদায়ক।

(৩)

দুপুরে খেয়ে দেয়ে শুয়ে আছি, আজ রায়হানের আসার কথা। আদতেই কি সে আসবে! আদতেই কি আমার কিছু একটা হবে! রায়হান সেদিন বলেছিল "টোকাই"য়ের জীবন, সত্যিতো এই মেসবাড়িতে কাটিয়ে দিলেম এতোগুলো বছর। টিউশ্যনি করতে করতে পায়ের স্যান্ডেল ক্ষয়ে ফেললাম নিজেও ক্ষয়ে গেলাম। না লাগলাম পরিবারের কাজে, না মিললো নিজের পরিবার।

আচ্ছা, রায়হান কি করে! আমাকেই বা কিসে ঢুকাবে! কেমন একটা সন্দেহে ডুবে গেলাম। সন্দেহের বাষ্পটা চুয়েচুয়ে ঢুকে পড়ল চিন্তায়। সান্ধ্য আঁধারে চিন্তাটা ক্রমশ যেন ছোট হয়ে যাচ্ছে। গুটিয়ে যাচ্ছে। গুটোতে গুটোতে একটা গিরগিটি হয়ে গেল। সেখান থেকে কেন্নো, আরও ছোট হচ্ছে। একেবারে ছোট মাছি হয়ে গেল। মাছিটা মুখের চারপাশে উড়ছে। অপেক্ষা করতে করতে কখন তন্দ্রা এলো। তন্দ্রা গিয়ে ঘুমের গভীরে প্রবেশ করে আমাকে সন্দেহের হাত থেকে বাঁচিয়ে প্রশান্তি এনে দিল।

এক রামে রক্ষে নেই সুগ্রীব দোসর, একে মশা তার সাথে আবার লোডশেডিং। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না। মশার কামড়ে ঘুম ভাঙলে আলুথালু বিছানায় উঠে বসি, দেখি রাত দশটা বাজে। লাল পেটফোলা মশাগুলো উড়তে না পেরে চারপাশে পরে আছে, রায়হান আসেনি।

এক সপ্তাহ পরে শনিবারে টিউশ্যনিতে যাবার জন্য রেডি হচ্ছি তখুনি রায়হানের ফোন এলো। টিউশ্যনিতে না গিয়ে আমি রায়হানের সাথে চললাম।

গাড়ি ছুটে চলেছে। ছুটিরদিন হওয়াতে রাস্তা মোটামুটি চলার মত আছে। পরিচিত এলাকা পেড়িয়ে গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে পশ এলাকার দিকে। মনে মনে ঠিক করে রেখেছি কোন প্রশ্ন করব না। রায়হান হাসতে হাসতে বলেছে, এল ডোরাডো যাচ্ছি কথা বলিস না। সময় তোকে বলে দিবে কি করতে হবে। সে আমার জন্য একটা পারফিউম এনেছে। গাড়িতে ওঠার পর বলল নে স্প্রে কর এটা তোর জন্য। তোকে তো র‍্যাড পিটের চেয়েও হ্যান্ডসাম লাগছে রে। শোন, কিছুদিনের মধ্যে তুই রিংরোডের ওই ফিটনেস সেন্টারে ভর্তি হয়ে যাস।

বিভিন্ন রাস্তায় চলার পরে শেষ পর্যন্ত গাড়ি এসে থামল দেশের ধনাঢ্য এলাকার একটি নান্দনিক বহুতল সুরম্য ভবনের সামনে।

রায়হানের কাছে কার্ড ছিল, আমরা পাঞ্চ করে ভেতরে ঢুকলাম।

সুসজ্জিত স্পেস। সুইমিং পুল ঘিরে বসার আয়োজন। পুলের পাণি কেমন যেন জমাটবাঁধা নীলচে সবুজ। কি একটা মৃদু সুর বেজে যাচ্ছে। ছোট ছোট টেবিল ঘিরে নিচু গদিমোড়া চেয়ারে মানুষজন বসা। অবাক হয়ে দেখলাম বেশিরভাগই নারী, বিগত যৌবনা বললে অসম্মান করা হবে। তারা অভিজ্ঞ নারী, যাদের কাছে বয়স কেবল একটা সংখ্যা। তাঁদের পড়ন্ত সৌন্দর্যের মখমলি ডানার পালক উড়ছে জায়গাটা জুড়ে। হাইড করা উৎসের নরম আলোক বিচ্ছুরণ তাদের চুল, নাকের ডগা, কানের পাথরে প্রতিফলিত হয়ে ঝিকমিক করছে। যেন স্রোতস্বিনী নদীর জলে রৌদ্রের ঝলকানি। কয়েকজনের মুখ খুব পরিচিত লাগল, দুম করে মনে পড়ল আরে! এরা তো সেলিব্রেটি। টিভিপর্দায়, পত্রিকায়, বহুবার দেখেছি। কিছু প্রিয়মুখও আছে এখানে।

রায়হান আমাকে ঢোকার মুখে কেবল বলেছে কেউ যদি পছন্দ করে, তার পছন্দে সায় দিবি, সাড়া দিবি। ওর কথা কিছুই বুঝিনি, তবে কিছু একটা ব্যাপার আছে, যা চেতনার জানালায় অস্বস্তিকর উঁকি মারছে। এখানে রায়হানকে অনেকেই চেনে। রায়হান বা আমার বয়সী বেশ কিছু স্মার্ট ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিম্বা কোন টেবিলে কাউকে সঙ্গ দিচ্ছে। কিছু টেবিলে ষোড়শোপচার। রঙিন পানীয়।

নারীরা কৃত্রিম রঙে রাঙানো। তাঁদের চেহারা, তাঁদের পোষাক, তাঁদের সেটিং চুল, তাঁদের ব্যক্তিত্ব থেকে ঠিকরে পড়ছে দ্যুতি, বিচ্ছুরিত হচ্ছে আলো। তারপরও মনে হচ্ছে, কোথায় যেন এক মলিনতা, এক দীনতা লুকিয়ে আছে পারিপাট্যের ভাঁজে ভাঁজে।

রায়হান এসে আমাকে নিয়ে একটু সরে এসে মৃদুস্বরে বলল

– দ্যাখ এই মানুষগুলোকে তুই ভালবাসতে পারিস। করুণা করতে পারিস। ঘৃণাও করতে পারিস। তোর ব্যাপার। জীবন আমাদেরকে সত্যি কিছু দেয়নি। লড়াই আমরা কম কিছু করিনি, যোগ্যতাও আমাদের কম ছিল না, তবু কোনো সুযোগ আমাদের জোটেনি। শুধু সোনালি সময় হুহু করে পেছনে চলে গেছে।

এরাও হয়ত কেউ কেউ প্রতারিত হয়েছে জীবনের কাছে। আমরা এদেরকে কিছু দেবার বিনিময়ে নিজের জীবনকে কিছুটা সহজ করে নিতে পারি। আমি একটুপরে চলে যাব। একজনের সাথে থাইল্যান্ড যাচ্ছি। সপ্তাহ খানিকের জন্য। মন চাইলে কাজে লেগে যা। ফিরে এসে কথা হবে, ইনিই আমাকে ওই গাড়িটা গিফট্ করেছিল।

ঘুরে দাঁড়ালাম। মেসে ফিরব। সাবান ডলে একটা গোসল দেব। কাল থেকে টিউশ্যনিতে যাব। আরেকটা টিউশ্যনির খোঁজে ছিলাম পেয়ে গেলে সেটাও শুরু করব। মোট হবে চারটে। নাহয় আর চারটে খুঁজে নেব। তারপর

একা এক পাহাড়ের সমতলে গিয়ে নির্মল বাতাসে বুক ভরে শ্বাস নেব। সবুজ ঘাসের উপর শুয়ে গভীর ঘুমে তলিয়ে যাব। এক ভোরে নবারুণের সাতরঙ ডানায় মেখে রঙিন এক পরিযায়ী পাখি এসে গান গেয়ে ঘুম ভাঙালে ভাঙবে নতুবা ভাঙবে না। এ লোকালয় এ সমাজ আর আমায় টানে না।

রায়হান এসে কানে কানে বলল আমাকে নাকি কে ডাকছে। গেলাম, বয়সী বটের ঝিলিমিলি পাতার মত নারী বসতে বলল। হালকা খাবারের সাথে চলল কথা বলা। ঝকঝকে গ্লাসে তিনি ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছেন, আমার দিকেও ঠেলে দিলেন। তিনি কথা বলছেন আমি হ্যাঁ হু করে চলেছি। এরপর তিনি বললেন,

– ওকে, চল এবার ওঠা যাক। অদূর থেকে সকলের অলক্ষ্যে রায়হান সায় জানিয়ে চোখ টিপে দিল। উঠে দাঁড়ালাম চলে যাব বলে। লম্বা লম্বা পদক্ষেপে ওই নারীকে পেছনে ফেলে, রায়হানের এল ডোরাডো পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছি বেরুবার দরজার দিকে, মশা, মাছি, লোডশেডিং এ ভরা আমার মেস, আমার ঠিকানা, আমার গন্তব্যের দিকে।

পেছনে না তাকিয়েও বুঝতে পারছি রায়হান অবাক ও ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

ওই নারীও কখন যেন দ্রুত আমার পাশে চলে এলেন, তিনি কি যেন বলে উঠলেন, তাঁর পা হঠাৎ টলে উঠল ...

অকস্মাৎ, নিজের অজান্তে হাত বাড়িয়ে দিলে তিনি এলিয়ে পড়লেন আরেক রায়হানের বাহুডোরে।

পৌষালী ঘোষ

হলুদ গোলাপ

খাটের উপর বসে রুক্মিণী। মোবাইলটা হাতে নিয়ে ঘড়ি দেখল, রাত দেড়টা। আর চোখে সত্যিই তাকাতে পারছেনা। ওই ভারী বেনারসী ছেড়ে এখন আবার এই ফুলের সাজ। গলায় হাতে ও কিছুই পরতে অভ্যস্ত না। কিন্তু কে শুনছে সেসব ? বনেদী বাড়ি, পুরোনো দিনের আদবকায়দা অনেক কিছুই আছে। দুই কাকীশাশুড়ি, তিন ননদ, বড় জা দুজন, পিসি শাশুড়ি তিনজন, শাশুড়ি মা ও তাঁর বোন, রাঙা ও ফুল মামী ... সব মিলিয়ে ফুলশয্যার আগে এতজনকে প্রণাম করার ঠেলায় ওর কোমরে আর কিছু নেই। তাও তো কিছুজনের বাড়ী কাছে বলে তাঁরা রাত্রে আর থাকেননি। নয়তো এই ক'দিনে বরকে ক'বার চোখে দেখেছে সন্দেহ।

বাড়ীর একমাত্র আদুরে মেয়ে রুক্মিণী সান্যাল। স্কুলে বরাবর ফার্স্ট বই সেকেন্ড হয়নি। কলেজেও সে টপ করেছে। ইউনিভার্সিটির ফ্রেশার্সের দিনেই রণর সাথে আলাপ। রণজয় দেব। কেমিস্ট্রি আর ফিজিক্স অনার্সের মেলবন্ধন। কমন ক্লাস কিছুই নেই। ক্যান্টিনের মধ্যেই একটু আধটু চোখের পলক। কিন্তু কখন যে ভালো লেগে গেল। কলেজ স্ট্রিটে বইকেনা থেকে নন্দন চত্বর, ওরা ভার্সিটির হট কাপল। পড়াতেও একটু যেন ঢিলেই পড়ল। ফলে ইউনিভার্সিটি আর টপ করা হলনা রুক্মিণীর।

কেমিস্ট্রিতে মাস্টার্স করেই রণ গেল বিদেশে, রিসার্চ স্কলার হয়ে। তিন মাস পর থেকেই আর ফোন নেই। যোগাযোগ নেই। একে একে সব সোশ্যাল মিডিয়ায়ও ব্লকলিষ্টে। কারণ কী? না সময় নেই। অথচ এই রুক্মিণীই ওর জন্যে কত পড়া নষ্ট করেছে। কত কীই করেছে।

হাসিখুশী জোভিয়াল মেয়েটা চুপ করে গেল। প্রাইভেট একটা নার্সিংহোমে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে রয়েছে। মাইনে খারাপ না হলেও ওর আরও ভালো কিছুই করার কথা।

বাবার কথা ফেলতে পারেনি রুক্মিণী। অসুস্থ ঠাম্মা, নাতনীর বিয়েটা দেখে যেতে চান। তাই এইভাবে সম্পূর্ণ অচেনা একজন মানুষকে তিন মাসের দেখায় সে বিয়ে করল। ছেলেটা খারাপ না। কিন্তু নতুন করে আর কাউকে চিনতে ইচ্ছে করেনা ওর।

অর্কজ্যোতি সিংহ রায়। মাল্টিন্যাশনাল কম্পানীতে কর্মরত। দেখতে শুনতেও ভালোই। পাঁচফুট ন ইঞ্চি হাইট। টল, ডার্ক অ্যান্ড হ্যান্ডসাম। কথা খুব গুছিয়ে বলে আর ভীষণ ভালো বাস্কেটবল খেলে। চেহারার মধ্যেই একটা অ্যাথলেটিক ভাব। কিন্তু তা বলে জয়েন্ট ফ্যামিলি ? কী করে মানাবে ও ?

ভাবতে ভাবতেই অর্ক এসে ঘরে ঢুকলো। দরজা বন্ধ করে আলমারীর সামনে গিয়ে কী যেন নিল। একি, আংটি টাংটি দেবে নাকি ? কিন্তু ও তো কিছুই কেনেনি। এসবে আর ওর মন নেই।

ভাবতে ভাবতেই ফুল দিয়ে সাজানো খাটে বসে পড়ল অর্ক। আগের মত আর সাজানোর ধরন না। মাঝে গোলাপের পাপড়ি আর চাদর দিয়ে হাঁস করা আর খাটের একদিকে গোলাপি কাপড়। চারদিকে ফ্লাওয়ার স্টিক। বাক্সে করে কী যেন এনেছে অর্ক – বুঝল রুক্মিণী।

... "মাটনটা কেমন খেলে ?"

এই প্রশ্নের জন্য এক্কেবারে তৈরী ছিলনা রুক্মিণী।

... "হ্যাঁ, ভাল। কিন্তু আমার চিকেন বেশী পছন্দ। এত অয়েলি খাবার আমি অ্যাভয়েড করি।"

... "ও! আমার আবার সপ্তাহে রোববার মাটন চাইই চাই।"

একটা স্মিত হাসি হাসল রুক্মিণী।

... "এই নাও তোমার গিফট!"

... "ক্যামেরা ?"

... "হুম্, ডিএসএল আর, একদম লেটেস্টটা"

... "কিন্তু ..."

..."তোমার ফেসবুকে অ্যাড করোনি ঠিকই, প্রোফাইলও লক। কিন্তু বাড়ির দেওয়ালে কত বাঁধানো ছবি। ওটা দেখেই বুঝেছিলাম।"

... "কিন্তু আমি তো কিছু নিইনি তোমার জন্য।"

... "তাতে কী ? তোমার ফেসবুকে ম্যারেড উইথ আপডেট করবে ? ওতেই আমি হ্যাপি। নাও শুয়ে পড়। মাঝে বালিশটা রাখলাম, বিশ্বাস করতে পার।"

নিশ্চিন্ত হল রুক্মিণী। তাই প্রতিবাদ না করেই শুয়ে পড়ল। কি ভাবল ওকে অর্ক ? মনটা একটু খচখচ করছিল ঠিকই। কিন্তু ওতো এখনো রনকেই ভালোবাসে ...

একটু তাড়াতাড়িই উঠল আজ রুক্মিণী। স্নান সেরে শাড়ি পরে নীচে নামল। ঠাম বলেছেন, কদিন শাড়ি পরতে। এ বাড়িতে দাদু রয়েছেন, ঠাম্মি গত হয়েছেন আজ দশ বছর। কিন্তু ঠাম্মির অভাব কেউ বুঝতেই দেয়না ওনাকে। এমন ঝলমলে একটা পরিবারে এসেও কিছুতেই খুশী হতে পারছেনা রুক্মিণী।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে না নামতেই কাকীমা ডাকলেন, "ওমা রুকু, আয়। আজ এত সকাল সকাল উঠলি কেন ?" এই নামেই এ বাড়ীতে এখন ওকে ডাকছে সবাই।

... "আসলে কাম্মা, নতুন জায়গা তো। ঠিক ঘুম আসছিল না।"

... "আয় বোস, চা খাবি আয় !"

... "তোমরা খাও, আমি একটু বাগান থেকে ঘুরে আসছি।"

কোনোরকমে ওই ভিড় থেকে সরে এল ও। সবাই অচেনা। ওর কাছের মানুষরা, যারা ওকে সবচেয়ে বুঝত, তারা কেউ নেই। বাগানে দুএকপা হাঁটতে না হাঁটতেই চোখে পড়ল এক হলুদ গোলাপ গাছ। রণকে প্রথম এই রঙেরই ফুল দিয়েছিল সে। আজ যেন তার কোনো অস্তিত্ব নেই। একদৃষ্টে গোলাপের দিকে যখন সে চেয়ে দেখছিল, কাঁধে আচমকা কে যেন হাত রাখল। চমকে উঠল সে। অর্কর মা। হাতের গ্রীন টির কাপটা ওর দিকে এগিয়ে দিলেন।

... তুই গ্রীন টি খাস না ? তোর বাবাকে দিয়ে আনিয়েছিলাম তুই আসার আগেই। দেখ, কেমন হল ? এসবতো আগে বানাই নি। আর শোন, তোর খাটের উপর দুটো কুর্তি আর লেগিংস রেখে এসেছি। জলে কেচে, শুকিয়ে, একটু নরম করা আছে, ওটাই পরিস। শাড়ি পরতে হবেনা। জানি, তুই ছোট প্যান্টগুলো পরিস। কিন্তু বুঝিসইতো মা। একসাথে থাকা। বাড়ি থেকে বেরোলে যা ইচ্ছে পরিস। বাড়িতেই যা একটু কষ্ট হবে তোর। একটু মানিয়ে নিস মা।"

... "মা !"

অজান্তেই ডাকটা বেরিয়ে এল ওর। চোখের কোণে যেন এক বিন্দু জল।

... "পাগলী মেয়ে", চিবুক ছুঁয়ে চুমু খেয়ে বললেন তপতীদেবী। "চা'টা খেয়ে নে, জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। আজ অফিস নেই তো ? তোদের বাবা গলদা চিংড়ি এনেছে। তোর মাকে ফোন করেছিলাম। বললেন মালাইকারি তোর প্রিয়। আমি যাই রান্না করি।"

চারদিকটা কেমন উজ্জ্বল হয়ে গেল। পছন্দের মানুষকে পায়নি ঠিকই। তবে ভাল মানুষদের পেয়েছে ও। একটা হলুদ গোলাপ ছিঁড়ল গাছ থেকে। এটাই আজ অর্ককে দেবে ও।

মিতা বোস

ফেলে আসা দিনের কথা

কি জানি কেন যেন আজ রজতদা তোমাকে খুব মনে পড়ছে। সেই কোন ছোটবেলা থেকে তোমাকে চিনতাম। না প্রথম আলাপ-ঠালাপের কথা মনে নেই। ওই সব রোমান্টিক কোন ঘটনা ছিল না। ব্যাপারটা ছিল খুব সাদামাটা। স্যার আশুতোষ কলেজের পাশাপাশি স্টাফ্ কোয়াটারে আমরা থাকতাম। আমার বাবা ছিলেন ওই কলেজের অধ্যক্ষ। আর তোমার বাবা ছিলেন বাংলার অধ্যাপক। তোমার বোন কৃষ্ণা ছিল আমার প্রাণের বন্ধু। স্নান খাওয়া আর রাত্রে ঘুমোবার সময় ছাড়া প্রায় সব সময় আমরা একসাথে থাকতাম। তুমি হয়তো তিন বা চার বছরের বড় ছিলে আমাদের থেকে। কিন্তু সব সময় এমন দাদাগিরি ফলাতে যে মনে হত কতো যেন বড়ো। আর তোমার দৌরাত্ম্যেরও কোন সীমা ছিলনা। হয়তো আমরা পুতুলের বিয়ে দিচ্ছি। ভীষণ ব্যস্ত। হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই তুমি এসে বর বা কনেকে নিয়ে ছুটে পালিয়ে যেতে। আরে কি করছ কি করছ বলে তোমার পেছনে আমরা ছুটে গেলে তুমি দূর থেকে চেঁচিয়ে বলতে, আরে বারে/বেড়াল তোদের মারে। স্কুল হতে ফিরে এসে যদি দেখতে আমরা নানা রকম ফুল, লতা-পাতা দিয়ে পুতুলদের জন্যে রান্না বসিয়েছি সাথে সাথে কড়াই উল্টে দিয়ে উনুনটি নিয়ে ছুট দিতে। কি দুষ্টুই না তুমি ছিলে। কতো বার যে মা, কাকিমাদের নালিশ করে তোমাকে বকা খাইয়েছি তার কোন হিসেব নেই। তোমার এই উৎপাতকে আমরা বলতাম বর্গি-র হামলা।

সেই তুমি শহরের কলেজে পড়তে গিয়ে একেবারে পাল্টিয়ে গেলে। খুব গম্ভীর দেখাত তোমাকে। হায়ার সেকেন্ডারিতে দুর্দান্ত রেজাল্ট করেছিলে। আমাদের জেলাতে ফার্স্ট আর বোর্ডে ফিফ্‌থ হয়েছিলে। কে জানত আমাদের বর্গি এতো ভালো রেজাল্ট করবে। অবশ্য জানতাম যে তুমি পড়াশুনতে ভালো। প্রতি বছর ক্লাসে ফার্স্ট হতে। তাই বলে এতটা। সারাদিন তো খেলাধুলো নিয়ে থাকতে। কখন যে পড়াশুনো করতে সেটাই ছিল আমাদের প্রশ্ন। যাইহোক, ছুটিছাটায় বাড়ি এলে বেশীর ভাগ সময়টা নিজের ঘরেই বই পড়ে আর গান শুনে কাটাতে। অবশ্য বলে না স্বভাব যায় না মরলে। যতই গুরু-গম্ভীর হওনা কেন, যাওয়া আসার পথে কখনো দেখা হলে আগের মতই ক্ষেপাতে ছাড়তে না। হয়তো বা কখনো বিনুনি টেনে দিয়ে চোখ নাচিয়ে বলতে, কিরে তোরা মুখ অমন রাম গরুর ছানার মতো করে রেখেছিস কেন ? এ্যানুয়াল পরীক্ষার রেজাল্ট বের হয়েছে না গতকাল ? ফেল করেছিস বুঝি ? শুনে আমি আর কৃষ্ণা চটে আগুন হয়ে যেতাম। তোমার মতো ভালো না হলেও আমরা তো খারাপ ছাত্রী ছিলাম না। আবার কখনো বলতো, কেমন আছিস ? ঠিকমতো পড়াশুনো করছিস তো ? কোন ক্লাস হলো এবার ? ফাইভ না সিক্স্ ? পতুলরা ভালো আছে তো ? এত রাগ হতো শুনে। আমরা তখন রীতিমত বড় হয়ে গেছি। স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ি। কলেজে যাওয়ার অপেক্ষায় দিন গুনছি। আর আমাদের বলে কিনা ফাইভ সিক্সে পড়ি। পুতুল খেলার দিন কবেই পেরিয়ে এসেছি।

যাইহোক, বেশ আনন্দের সাথেই দিন কেটে যাচ্ছিল। এরমধ্যে কলকাতায় দিদির বিয়ে ঠিক হওয়াতে আমরা সবাই কলকাতা যাই। দিদির বিয়ের পর দিদিমা, দাদু, মামা, কাকা, মাসি, পিসিরা সবাই আমার আর মেজদির বাংলাদেশে ফিরে যাওয়া নিয়ে খুব আপত্তি করেছিল। আমরা ছাড়া আমাদের সব আত্মীয় স্বজনরা পার্টিশনের পরেই বাংলাদেশ ছেড়ে কলকাতা চলে এসেছিল। তখন বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থাও খুব একটা ভালো চলছিল না। সবার মতে আমরা বড় হয়ে গেছি। কবে কখন কি বিপদ হবে তার থেকে কলকাতায় থেকে যাওয়াই ভালো। অনেক ভাবনা-চিন্তা, আলাপ আলোচনার পর ঠিক হলো বাবা আর ছোড়দা ফিরে যাবে যাতে সব কিছু গুছিয়ে বরাবরের জন্য চলে আসতে পারে। মা, আমি আর মেজদি জামসেদপুরে মেজদার কাছে থেকে যাব যতদিন না বাবা আর ছোড়দা কলকাতায় ফিরে আসে। শুনে তো আমাদের খুব মন খারাপ। আগে থেকে যদি জানতাম আর ফিরে যাব না তাহলে অন্তত্য বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত সবার থেকে ভালো করে বিদায় নিয়ে আসতাম।

এরপর আজ পর্যন্ত আর বাংলাদেশে যাওয়া হয়নি । প্রথম প্রথম মন খারাপ হলেও নতুন দেশ, নতুন বন্ধু-বান্ধব সব মিলিয়ে আস্তে আস্তে নতুন জীবনে অভ্যস্ত হতে বেশী সময় লাগেনি । কৃষ্ণার সাথে চিঠিতে বেশ ভালো যোগাযোগ ছিল । ওর চিঠিতেই তোমার সব খবর পেতাম । ও লিখেছিল আমরা আর ফিরব না শুনে তুমি এতটাই অবাক হয়েছিলে যে কিছু না বলে তোমার ঘরে চলে গিয়েছিলে । পরে নাকি কৃষ্ণাকে বলেছিলে, ও এত কি দামী যে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হলো ? এখানে আমরা সবাই তো আছি । এরপর নাকি আর কোনদিন আমার সম্বন্ধে কিছু বলে নি । আমরা কলকাতায় চলে আসার প্রায় বছর চারেক পর হঠাৎ একদিন লন্ডন হতে তোমার একটি চিঠি পেয়ে খুব অবাক হয়েছিলাম । তুমি লিখেছিলে, পরের বছর দেশে ফেরার পথে কলকাতায় আসবে আমার সাথে দেখা করতে । তোমার কিছু কথা বলার আছে আমাকে । তুমি যে লন্ডনে গিয়েছিলে ফিজিক্সে পি-এইচ-ডি করতে তা কৃষ্ণার চিঠিতে আগেই জেনেছিলাম । চিঠিতে কোন ঠিকানা না থাকায় তোমার সাথে আমার যোগাযোগ করার কোন উপায় ছিল না । ঠিকানা বিহীন চিঠি পেয়ে সত্যি খুব বিরক্ত লেগেছিল । মনে হয়েছিল তোমার সব কিছুই অদ্ভুত । ঠিকানা না দিলে আমি কি করে উত্তর দেব । একবার ভেবেছিলেম কৃষ্ণার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে তোমাকে চিঠি লিখব । কিন্তু মনে হয়েছিল তুমি নিশ্চয়ই উত্তর চাও না তাই ঠিকানা দাওনি । তাহলে কেন শুধু শুধু বিরক্ত করব । তখন আমি কলকাতায় বি এ পড়ি । বাবারা ফিরে আসার পর আমরা জামসেদপুর থেকে কলকাতায় চলে এসেছিলাম ।

যাইহোক এর কিছুদিনের মধ্যেই সেই বিভীষিকাময় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছিল । রেডিওতে রক্তহিম করা সব খবর শুনে বাংলাদেশে থেকে যাওয়া পরিচিতজনরা সবাই কেমন আছে জানার জন্য আমরা খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম । কিন্তু কারো সাথেই কোনভাবে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছিলনা । অমি কৃষ্ণাকে সেইসময় অনেক চিঠি লিখেছিলাম । কিন্তু একটারও কোন উত্তর আসেনি । সত্যি বলতে কি সেই যে কৃষ্ণা হারিয়ে গেল আজও ওর কোন খবর পাইনি । পরে অবশ্য জেনেছিলাম খান সেনারা কাকিমা আর কাকাবাবু মানে তোমার বাবা আর মাকে খুন করে কৃষ্ণাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল । তোমার ফুলের মতো নিষ্পাপ ছোট ভাই-বোন, মীনা আর সঞ্জুও খান সেনাদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি । একমাত্র তুমিই বেঁচে গিয়েছিলে বাইরে থাকার জন্য । ওই খবরটা পাওয়ার পর কত রাত যে না ঘুমিয়ে কাটিয়েছি আর কত যে কেঁদেছি তার হিসেব আমার কাছেও নেই । জানিনা কৃষ্ণা এখনোও বেঁচে আছে কিনা । ও তো আমার ঠিকানা জানতো, বেঁচে থাকলে কি একবারের জন্যও যোগাযোগ করতো না ? কি জানি । না তুমি পরের বছর দেখা করতে আসনি । আর কোন যোগাযোগও করনি । তোমার ওপর দিয়ে যে কত বড় ঝড় গেছে সেটা ভেবে তোমার জন্য খুব চিন্তা হতো । মনে হতো তুমি ভালো আছ তো ? খুব কষ্ট হতো, দুঃখ হতো । আর অভিমান সে তো ছিলই । আবার মাঝে মাঝে তোমার উপর খুব রাগ ও হতো । অত নাটকীয়তার কি কোন দরকার ছিল ? চিঠি যখন দিয়েই ছিলে তখন ঠিকানা দিলে কি ক্ষতি হতো বলো ? তাহলে অন্তত তোমার সাথে তো যোগাযোগ করা যেত ।

দিন কারো জন্য বসে থাকেনা । সময় চলে যায় দিন চলে যায় । সময়ের পলিমাটি আমাদের অনেক কিছু ভুলতেও সাহায্য করে । এর বছর দুয়েক পর হঠাৎ করেই সাতদিনের মধ্যে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে যায় । ছেলে বাইরে থাকে । ছুটি কম তাই অত তাড়াহুরো বিয়ের । যাইহোক, বিয়ের আগের দিন সন্ধ্যেবেলা বন্ধুরা সব মিলে যখন গল্প করছিলাম তখন মেজদি এসে বাবা আমাকে বাইরের ঘরে ডাকছেন বলাতে, ওখানে গিয়ে দেখি বাবা আর একটি ছেলে বসে কথা বলছে । আমাকে দেখে ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়েছিল । বাবা বলেছিলেন, চিনতে পারলি ওকে ? চেনা চেনা মনে হচ্ছিল যদিও তবু ঠিক বুঝতে পারছিলাম না কে ও । আমাকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বাবা হেসে বলেছিলেন, আরে ও আমাদের রজত । বাবার কথায় চমকিয়ে উঠেছিলাম । ভালো করে তাকিয়ে দেখি সত্যিই রজতদা । দাড়ি রেখেছে তাই চিনতে পারিনি । ওর মুখে বিষাদের ছায়া যেন দেখেছিলাম । জানিনা সেটা আমার কল্পনা ছিল কিনা । আগের মতোই হেসে রজতদা বলেছিল, কি রে কেমন আছিস ? শুনলাম কাল তোর বিয়ে ? আমি কোন কথা বলতে পারছিলাম না । তখন আমার দু-চোখ জলে ভরে উঠেছিল আর গলার মধ্যে ব্যথা করছিল । মা সেইসময় ওদের জন্য চা নিয়ে এসে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন । কোনমতে তুমি বসো রজতদা, চা খাও বলে পালিয়ে এসেছিলাম । সেই শেষ এরপর আর তোমার কোন খবর পাইনি । বাবা আর মা তোমাকে অনেকবার অনুরোধ করেছিলেন বিয়েতে আসার জন্য । কিন্তু

পরেরদিন ফিরে যাচ্ছো তাই আসতে পারবেনা বলেছিলে তুমি। সত্যিই কি পরেরদিন ফিরে যাওয়ার কথা ছিল ? নাকি ওটা একটা অজুহাত ছিল ? কি জানি ?

সেদিন রাত্রে শুয়ে আবার অনেকদিন পর কেঁদে ছিলাম কৃষ্ণার জন্য, আমাদের ফেলে আসা দিনেগুলোর জন্য। আর হয়তো তোমার জন্যও। মনে মনে বলেছিলাম, রজতদা তুমি কি সেই না বলা কথাটা বলতে এসেছিলে ? যদি এলেই তাহলে আর এক সপ্তাহ আগে কেন এলে না ? আমি তো সেই কবে থেকে তোমার আসার অপেক্ষায় ছিলেম।

হুমায়ূন কবির

গন্তব্য

কল্পনা করে নাও একটা রেলগাড়ি। যেমন ধরা যাক ধোঁয়া ওড়া ঝিকি ঝিকি চোঁ চোঁ কয়লার গাড়ি। অথবা ধরে নাও অত্যাধুনিক দ্রুতগামী শব্দভেদী ট্রেন। ভেতরে তুমি দৌড়াচ্ছ অনবরত। গার্ড কামরা থেকে শুরু করে ইঞ্জিনের দিকে, কামরার পর কামরা দৌড়ে চলেছো ক্রমাগত। আর ট্রেন চলছে দ্রুতলয়ে, চড়াই উৎরাই।

পেছনের অপসৃয়মান ষ্টেশনটি ক্রমশ বিলীন দূরে, অথচ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ তার নামফলক – "অতীত নগর"। স্মৃতি জাগানিয়া এই নামটি ধীরে ধীরে স্থান করে নেয় তোমার মনে। কথায় কথায় পাশের যাত্রীটি জানালেন এই ট্রেনের মাত্র দুটোই স্টেশন; সামনের স্টেশনটির নাম অনন্তপুর।

– কী চমৎকার নাম, তাই না ?

অন্য একজন বললো,

– এই নামে কিছু নেই, কেবলই ভূয়া।

– তাহলে কোথায় যাচ্ছি আমরা ?

এই নিয়ে বাদানুবাদ শুরু হলো। অবশেষে দৌড়াতে দৌড়াতে, হাঁপাতে হাঁপাতে, আর তর্ক করতে করতে ক্লান্ত হয়ে একসময় হাল ছেড়ে দিলে তোমরা সবাই।

এবার খানিক জিরিয়ে নিতে বসেছো তুমি। পাশের লোকটিও তাই। জিজ্ঞেস করলো,

– ভাই, কবে ফেরত আসবেন ?

– না-রে ভাই, ফেরত আসা হবে না।

– বাহ! তাহলে নিশ্চয়ই দারুণ একটা প্রাপ্তির ভরসায় যাচ্ছেন!

কথাটা ভাল লাগল না তোমার। ভুরু কুঁচকে বললে,

– আপনি ? আপনি ফেরত আসবেন ?

লোকটি চুপ করে থাকলো অনেক্ষণ। তারপর বললো,

– চাইলেই কি আসা যায় ? জানেন না বুঝি!

এবার তোমরা দুজনেই চুপ করে থাকলে। একটু পরে পানীয় পরিবেশন করতে যে মেয়েটি এলো, তার নাম কল্পনা। মুগ্ধ হয়ে তোমরা দুজনেই একসময় তাকে ভালোবাসতে শুরু করলে। তার নীল চোখের ভেলায় ভাসতে ভাসতে হারিয়ে যাচ্ছ ক্রমশ। ট্রেন চলছে পর্বত ও প্রান্তর ছাড়িয়ে, দুলুনিতে দুলুনিতে ঘুম আসে, ঘুম যায়। আধো ঘুমে স্বপ্ন দেখতে দেখতে তোমরা ভুলেই গেলে কখন যে কল্পনার মৌতাতে স্বপ্নময় হয়ে উঠলো তোমাদের ক্ষণিক বর্তমান।

একসময় হুইসেল বাজলে সম্বিত ফিরে এলো, অবাক হয়ে খেয়াল করলে এই ট্রেনে এখন তোমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ নেই। বাকিরা সবাই উধাও। হঠাৎ ট্রেন থামার কসরত শুরু হলো। গতি হ্রাসের তীব্রতায় একে অপরের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলে, তোমাদের সবার চেহারা অবিকল এক! অথচ কেউ কাওকে চেনো না। পরস্পরকে জানার তীব্র আকাঙ্খা এসে ভর করলো তোমাদের মনে, কিন্তু চেনা জানার সময় নেই এখন আর। অকারণেই স্পষ্ট আকর্ষণ বোধ হতে থাকলো তোমাদের। ঘনিষ্ট আপন জনের মতো একে অপরকে জড়িয়ে ধরে থাকলে প্রচণ্ডভাবে, নৈশব্দ নৈকট্যে; অভিকর্ষণের প্রচন্ড চাপে মিশে গেলে এক হয়ে, দ্রবিভূত পঞ্চভূত – বৃত্ত থেকে বিন্দুবত। অতঃপর ক্রমশ ক্ষুদ্রতর, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনু পরমাণু কণিকা ...

ট্রেন চলছে। তোমাদের কণিকারা এবার আলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। অনন্তপুরের সাইনবোর্ড সহ সামনের স্টেশনটি হঠাৎ উধাও, অদৃশ্য অতীত নগর। ফাঁকা ট্রেনে কেউ নেই আর। তোমরা এখন গতির অতীত, অদৃশ্য বোধি। ত্রিকালোর্ধ্ব স্তব্ধ সময়। এ জগতে শুরু ও সমাপ্তি নেই। কোনও উপাত্ত্ব নেই, তোমাদের অনন্ত অস্তিত্ব ছাড়া।

রূপা মজুমদার

নারায়ণ সান্যাল – একাই একটা ইন্ডাস্ট্রি

দেবদাসী।

"দেবদাসী" শুনলেই মনে একরাশ কৌতুহলের উদ্রেক হয়।

১৯৪৯ সালে প্রিভেনশন অফ ডেডিকেশন অ্যাক্ট এর ফলে দেবদাসী প্রথা অবলুপ্ত হয়।

কিন্তু তারপর ?

কোথায় গেলো তারা ?

তারা নৃত্যগীতে পারদর্শী। তারা অপূর্ব সুন্দরী, সুতনুকা তারা।

তারা চন্দন ঘষতে পারে, তারা মালা গাঁথতে জানে, দেবতার নৈবেদ্য সাজাতে জানে, তারা মন্দির পুরোহিতের নির্দেশে অতিথিকে তৃপ্ত করতে বিছানায় উঠে শুতেও জানে।

কিন্তু তারা রন্ধন কার্য জানেনা, সন্তান পালন করেনি, সংসারের আর পাঁচটা কাজও পারেনা।

তাছাড়া সমাজ তাদের ভিন্ন চোখে দেখে অতএব মন্দির থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর পিতৃগৃহে তাদের ঠাঁই হয় নি।

তাহলে মেয়েগুলো যাবে কোথায় ?

মাথার ওপর ছাদ, পরনের কাপড়, দু'বেলা দু'মুঠো আহার কে ব্যবস্থা করবে ?

বিষয় নির্বাচনের বৈচিত্রের কারনে বাংলা সাহিত্যে নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন নারায়ণ সান্যাল। শিল্প স্থাপত্য ভাস্কর্য বিজ্ঞান নিয়ে তার লেখা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। পেশায় ছিলেন তিনি ইঞ্জিনিয়ার, পি ডবলু ডি তে কর্মরত ছিলেন। আমার বাবা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে পি ডবলু ডি তে যখন জয়েন করেন তখন নারায়ণ সান্যাল মধ্যগগনে। বিভিন্ন জায়গায় তিনি ডেপুটেশনে পোস্টেড ছিলেন। বাবা ও তাই। সুতরাং মাঝেমধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হত পরিচয়টা রয়ে গেছিল।

তারও অনেক পরে – তখন তিনি রিটায়ার্ড, একবার একটা বিশ্বকর্মা পূজোর খাওয়া-দাওয়া অনুষ্ঠানে বাবার আমন্ত্রণে এসেছিলেন। তখন আমি কলেজের ছাত্রী। ওনার সঙ্গে পরিচয় করার সুযোগ হয়। তার লেখার প্রতি অনুরক্ত ছিলাম, দেখে অনুরাগ দ্বিগুণ বেড়ে গেলো। অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন নারায়ণ সান্যাল। সহজ অথচ রাশভারী।

জানিয়েছিলাম দেবদাসীদের জীবন আধারিত উপন্যাস "সুতনুকা একটি দেবদাসীর নাম" পড়ে চমৎকৃত হয়েছি। তখন অবশ্য জানতাম না দ্বিতীয়বার ওনার সঙ্গে দেখা হবে ওই বইয়ের প্রকাশক এর আমন্ত্রণ সভায় !!

শুনে হেসে বলেছিলেন,

"তোমারও দেবদাসীদের নিয়ে কৌতুহল ? আম্রপালি পড়েছ ? সেখানে কিন্তু আমার নায়ক রসায়নের অধ্যাপক। রসায়নের ছাত্রী তুমি, আমার নায়েককে তোমার পছন্দ হবে।"

জানিয়েছিলাম পড়বো, নিশ্চই পড়বো।

ব্যক্ত করে ছিলাম কাটা সিরিজে তার সৃষ্ট চরিত্র – সত্যসন্ধানী, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ব্যারিস্টার "বাসু সাহেবের" প্রতি ভালোলাগা।

দ্বিতীয় বার দেখা হয় বই মেলার মাঠে, দেব সাহিত্য কুটিরের বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে ।

২০০৩ বা ২০০৪।

আমি তখন দেব সাহিত্য কুটির পরিবারের সদস্য, সুতরাং নতুনরপে পরিচয় হয়েছিল ।

নারায়ণ সান্যাল ১৫০'রও বেশি বই লিখেছেন, কিন্তু একটি বইতেও নিজেকে পুনরাবৃত্ত করেননি। আজকাল তো "জনর" শব্দটি বহুল প্রচলিত। এক একজন সাহিত্যিক এক একটি জনর লেখেন বা ওই বিশেষ বিভাগে তিনি বিশেষ জনপ্রিয়। কিন্তু তাঁকে দেগে দেওয়া যায়নি কোনও বিশেষ "জনর" দিয়ে। প্রকাশক গলদঘর্ম হয়েছেন তাঁর লেখা বইকে বিষয়ভিত্তিক সাজাতে। এক একটি বই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে, আবার প্রতিটি বই দু' তিনটি বিষয়ভুক্ত।

তাঁর বহুপঠিত "বিশ্বাসঘাতক" উপন্যাসটিকেই ধরা যাক। গতে বাঁধা উপন্যাস বলতে বাধে একে, কারণ উপন্যাসে কেমিস্ট্রির ফরমুলা অপ্রত্যাশিত। বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থও না, কারণ সেক্ষেত্রে রোম্যান্টিক কাহিনি অপাঙক্তেয়। শেষ দৃশ্যে অপরাধী নিজেই ধরা দিচ্ছে, তাই গোয়েন্দা কাহিনি হবার প্রশ্নই নেই। এই উপন্যাস আসলে এই সবকটা ঘরানার অনবদ্য এক মিশ্রণ। বড় যত্নে তৈরি একটি ব্যতিক্রমী উপন্যাস।

নারায়ণ সান্যাল জানতেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর জাত নির্ধারণে বারবার অসমর্থ হবে। প্রতিটি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের হাত একবার হলেও আটকে যাবে তাঁর বই হাতে নিয়ে। কোন তাঁকে রাখা যাবে এই বইকে ? বিষয়ভিত্তিক আলমারি তাঁর জায়গা নয়। তাঁর নামে নতুন তাক খোলা হবে। তিনি বিষয়ে নয়, বিষয় তাঁর মধ্যে সম্পৃক্ত হবে।

একেবারে শুরুর দিকে তাঁর লেখা "বকুলতলা পি এল ক্যাম্প"। দেশ ভাগের পর রিফিউজি দের নিয়ে তাঁর লেখা "বকুলতলা পি এল ক্যাম্প" উপন্যাস সাড়া ফেলে দিয়েছিল সারা বাংলায়। প্রথমবার দেখতে পাওয়া হয় দান্তের "ইনফারনো"-র সেই অমোঘ লাইন "ত্যাজ সব আশা, যার প্রবেশ নিরত এইখানে।" জীবনের শেষ লগ্নে সেই দান্তের জীবন নিয়েই লিখলেন "দান্তে ও বিয়েত্রিচে"।" বাংলা ভাষায় দান্তে চর্চার মাইলস্টোন।

একদিকে যখন খটোমটো হিসেবনিকাশে ভরা রসকষহীন বাস্তুবিজ্ঞানের টেক্সট বই লিখছেন, প্রায় একই সঙ্গে লিখে চলেছেন শিশুদের জন্য একেবারে যুক্তাক্ষর বর্জিত "হাতি আর হাতি"-র মতো আশ্চর্য বই। শুধুমাত্র একটা সত্যকাম লিখেই অমর হতে পারতেন তিনি। কিংবা "রূপমঞ্জরী" কিংবা "অজন্তা অপরূপা"। কী অপূর্ব ছবিই না এঁকেছিলেন এই বইয়ের পাতায় পাতায়! ইতিহাস, শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং আর সাহিত্যের এমন মেলবন্ধন বাংলা সাহিত্যে আজ অবধি আর হয়নি।

স্বয়ং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মুগ্ধ হয়েছিলেন এই কাজে। নিজের হাতে সংশোধন করে দিয়েছিলেন বইয়ের বেশ কিছু অংশ। ১৯৬৯ সালের রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়ে সম্মানিত হন তিনি এই অসামান্য কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ।

তারপর ?

এর পরেই প্যারি ম্যাসনের তথাকথিত পাল্প গোয়েন্দাগল্প অবলম্বনে "কাঁটা সিরিজ" লিখতে বসলেন!

ভাবা যায় ? এখানেই উনি অনন্য ।

আবার এই লেখকই লিখছেন "আমি নেতাজীকে দেখেছি", "আমি রাসবিহারীকে দেখেছি" কিংবা "নেতাজীর রহস্য সন্ধানে"-র মতো গবেষণামূলক বই ।

ছোট বড় সব ধরনের পত্রপত্রিকায় লিখেছেন । তাই তথাকথিত বড় হাউসের আনুকূল্য পান বা তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন নি, কারণ তাঁর সোনার শিকল ধারণ করার মানসিকতা ছিল না । তাঁর বিশ্বাস ছিল নিজের কলমের ওপর । এবং সেটা সঠিক ছিল । জীবদ্দশাতেই দেখে গেছেন, তাঁর পাঠকের ঢল নেমেছে বইমেলায় । কলেজস্ট্রিটে । পাড়ার বইয়ের দোকানে ।

আর কী অপুর্ব তাঁর ভাষা! কখনও একেবারে শরদিন্দুসম মহাকাব্যিক, আবার তারপরেই নেমে আসে মাটির কাছাকাছি । আম্রপালীতে যিনি লেখেন "এমন কত কত পুরুষই তো সম্মোগরাত্রি শেষে যাত্রা করেছে প্রাসাদ ত্যাগ করে; কিন্তু এ প্রস্থান তো শুধু প্রস্থান নয়, এ যে আম্রপালীর জীবনে এক মহাভিনিষ্ক্রমণ!" তিনি আবার "নক্ষত্রলোকের দেবাতাত্মা"-তে বিজ্ঞান বোঝান এই ভাষায় "আইনস্টাইন তাঁর স্পেশাল থিয়োরিতে দুয়ে দুয়ে খাঁটি দুধই বানালেন না, ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরিতে সেই দুধ জ্বাল দিয়ে ক্ষীরও তৈরি করলেন । দল বেঁধে ফুচকা খেতে অভ্যস্থ তোমার আমার পাকস্থলী যদি সেই ক্ষীর হজম করতে না পারে তবে দোষ আমাদের পাকস্থলীর – ওই খাঁটি ক্ষীরের নয়" । বিজ্ঞান আলোচনায় আচমকা লিখে ফেলেন লিমেরিকও –

"বাপরে কি চটপটে পালোয়ান ভোম্বল / বন-বন, সাঁই সাঁই ঘোরাতো সে ডাম্বল !"

শুধু কবিতা ?

নিজের হাতে আঁকা ছবি, মডেল, ডায়াগ্রামে ভরা থাকত তাঁর বইয়ের পাতার পর পাতা । জটিল তত্ত্ব সব নিমেষেই জল হয়ে যেত ।

টেলিভিশনের জন্য লিখেছেন "উরু কাতু মদনা"-র মতো টেলিসিরিয়ালের গল্প । নিজে পরিচালনা করেছেন । অভিনয় করেছেন । তাঁর লেখা গল্প থেকে ছবি হয়েছে – "সত্যকাম", "যদি জানতেম", "পাষণ্ড পণ্ডিত", "নীলিমায় নীল", "অশ্লীলতার দায়ে" । সংস্কৃতির কোনও আনাচকানাচে হাত রাখতে বাকি রাখেন নি । তিনি একাই একটা ইন্ডাস্ট্রি ।

লেখকের আসল মূল্যায়ন হয় তাঁর মৃত্যুর পরে ।

আজও তাঁর লেখা বইগুলি পুনর্মুদ্রিত হয়, বেস্টসেলার লিস্টে জায়গা পায় ।

এটাই তাঁর প্রকৃত মূল্যায়ন ।

প্রকৃত স্বীকৃতি ।

রূপা মজুমদার – বাংলা সাহিত্য জগতে পরিচিত অক্ষরকর্মী । বৈবাহিক সূত্রে দেব সাহিত্য কুটির পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হন এবং ২০১৫ সাল থেকে দেব সাহিত্য কুটিরের কর্ণধার । সম্পাদনা করেছেন নবকল্লোল শুকতারা । এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন যেমন জাগো বাংলার ফিচার এডিটর, বাঙলা OTT platform hoichoi এর কন্টেন্ট consultant. সম্প্রতি নিজস্ব প্রকাশনা করেছেন Raunaq Publication. যুক্ত আছেন আমেরিকার বঙ্গ সম্মেলন কমিটির সঙ্গে ২০২১ থেকে । দেশ এবং বিদেশের বহু সেমিনারে আমন্ত্রিত হয়েছেন বাংলা সাহিত্য নিয়ে বক্তব্য রাখার জন্য, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ২০১৯ বাংলাদেশ, ২০২০ প্যারিস, ২০২২ লাসভেগাস । তিনি পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশনের সদস্য, বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স এর সদস্য এবং একাধিক কাগজ ও পত্রিকাতে লেখালেখি করেন নিয়মিত ।

ফারুক ফয়সল

রথ হয়ে, জয় হয়ে, চিরন্তন কাব্য হয়ে এসো

কবি বিনয় মজুমদার কলকাতায় থাকতে চেয়েছিলেন। কবি ও কবিতার সান্নিধ্যে। তাঁর জীবনে সেটিই হয়ে উঠল না আজীবনের সঙ্গ। জন্মাবধি ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তাঁর জীবন এক জায়গায় স্থির ছিল না। বহুবিচিত্র তাঁর জীবন ধারা। জন্মের দেশ ছিল তদানীন্তন বার্মা মুলুক, বর্তমানের মায়ানমার। জন্মের শহর ছিল মিকটিলা জিলার টোডো। পড়াশুনার হাতে খড়ি ও ১২ বছর বয়স অবধি সেখানকার বিদ্যালয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ১৯৪২ সালে পিতা-মাতা ও ভাই-বোনদের সাথে তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) ফরিদপুরের তাড়াইল গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেন। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে তাঁরা সপরিবারে এখানকার পাট চুকিয়ে কলকাতায় আবাস গড়ে তোলেন। এরপরের শিক্ষাজীবন কলকাতায়। ১৯৫১ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। ১৯৫৭ সালে গণিত শাস্ত্রে রেকর্ড পরিমাণ নম্বর নিয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৫৮ সালে শিবপুর বি.ই কলেজ থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করেন। কথিত আছে যে গণিত শাস্ত্রে তাঁর প্রাপ্ত নম্বরের রেকর্ড আজও কেউ ভাঙতে সক্ষম হয়নি। গণিত শাস্ত্রকে তিনি মনেপ্রাণে ভালোবেসেছিলেন। সমান হৃদয়াবেগ ও প্রীতিতে প্রেমে পড়েছিলেন কবিতার সাথে। কৃতী ছাত্র হিসাবে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার আমন্ত্রণ তিনি গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। একইভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন জাপানে প্রজেক্ট ইঞ্জিনীয়ারের চাকুরী। তিনি কবি হতে চেয়েছিলেন এবং কবির জীবন যাপন করতে চেয়েছিলেন।

কাঙ্খিত সেই জীবন যাপন করতে গিয়েই হয়তো তিনি অন্য দশজন থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর জীবন বোধ, চেতনা, যাপিত জীবন অন্যদের থেকে পৃথক হয়ে পড়েছিল। ১৯৫৮ সালে শিক্ষা জীবন সমাপ্ত হওয়ার পর পরই প্রকাশিত হয়েছিল "অতীতের পৃথিবী" নামের অনুবাদগ্রন্থ। একই বছর গ্রন্থজগৎ থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "নক্ষত্রের আলোয়"। এ পর্যন্ত সব ঠিকঠাক চলছিল। সম্ভবত তিনিই প্রথম ও একমাত্র কবি একটিও কবিতা কোন পত্রিকা বা কোথাও প্রকাশের আগেই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। বাধ সেধেছিল চাকুরি। সরকারি চাকুরি নিয়ে কলকাতার বাইরে যাওয়া, বাধাধরা খটখটে নিয়মের জীবন তাঁর পছন্দ না হওয়ায় কলকাতা ফেরার তাগিদ অনুভব করতে থাকেন। তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে, সম্ভাব্য পারিবারিক জীবন নিয়ে উদ্বিগ্ন বাবা তাঁকে চাকুরী না ছাড়তে, বেশি টাকার আশায় কলকাতায় কোন প্রাইভেট কোম্পানী বা ফার্মে চাকুরির চেষ্টা হতে বিরত থাকার পরামর্শ দেন। তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত বড় ভাই চাকুরী না ছাড়তে এবং কলকাতা না ফিরতে বলেন। এমন কি তাঁকে বিরত করতে জানিয়ে দেন যে কলকাতায় তাঁর বৌদি আছেন, সুতরাং তাঁর থাকার জায়গা হবে না। কিন্তু তিনি কলকাতার সাহিত্যিক জীবন মিস করতেন। বন্ধু কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে বারম্বার অনুরোধ করেছিলেন তাঁকে কলকাতায় ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে। তিনি চাকুরি ছাড়েন। নানা ভাষা শিক্ষা, দেশে বিদেশে গণিত নিয়ে গবেষণাধর্মী লেখা নিয়ে ব্যস্ত থেকেছেন। কোন চাকুরিতে স্থায়ী হননি। একের পর এক চাকুরি ছেড়ে কবিতাকে আঁকড়ে বাঁচতে চেয়েছেন। তাঁর উপলব্ধি তিনি ব্যক্ত করেছেন, "জড়, উদ্ভিদ, কীট পতঙ্গ, মানুষ, সবার সৃষ্টিরহস্য এক। সে কথা উপলব্ধির পরেই শুরু হলো কবিতা নিয়ে পথ চলা, আমার নিজস্বতা।"

কবিতায় তাঁর পথ স্বতন্ত্র। তাঁর জীবন বোধ, কবিতায় তার প্রকাশ ভিন্ন স্বরের। তিনি লেখেন –

ফিরে এসো, ফিরে এসো, চাকা,
রথ হ'য়ে, জয় হ'য়ে, চিরন্তন কাব্য হ'য়ে এসো।
আমরা বিশুদ্ধ দেশে গান হবো, প্রেম হবো, অবয়বহীন
সুর হ'য়ে লিপ্ত হবো পৃথিবীর সকল আকাশে।

১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল কবি বিনয় মজুমদারের কবিতার বই "ফিরে এসো চাকা"। এই বইয়ের রিভিউ লিখতে গিয়ে তাঁর বন্ধু কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখলেন, "বিনয় চাইলে যে কোন কিছু নিয়েই কবিতা লিখতে পারে। মল-মূত্র-গোবর নিয়েও পারে।" হাংরি আন্দোলনের জনক মলয় রায় চৌধুরীর মতে – "ফিরে এসো চাকা" ছিল বাংলা কবিতার জগতে এক ক্যামব্রিয়ান বিস্ফোরণ। ঐ কাব্যগ্রন্থের পাশে অন্য সকল কবিদের কবিতা জলো হয়ে যাচ্ছিল। ঋত্বিক ঘটকের অভিমত, "আমি সাম্প্রতিক কালের এক কবির সম্পর্কে আস্থা রাখি, যিনি কবিতার জন্য যথার্থ জন্মেছেন। আমার মনে হয় এ-কালে বাংলাদেশে এতোবড় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কবি আর জন্মাননি। তিনি বিনয় মজুমদার।"

"ফিরে এসো চাকা"র পঙ্‌ক্তিগুলি পাঠকের মুখে মুখে ফিরছে তখন। কবিতার আড্ডায় পড়া হচ্ছে –

"একটি উজ্জ্বল মাছ একবার উড়ে
দৃশ্যত সুনীল কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে স্বচ্ছজলে
পুনরায় ডুবে গেল – এই স্মিত দৃশ্য দেখে নিয়ে
বেদনা গাঢ় রসে আপক্ক রক্তিম হল ফল।
বিপন্ন মরাল ওড়ে, অবিরাম পলায়ন করে,
যেহেতু সকলে জানে তার সাদা পালকের নিচে
রয়েছে উদগ্র উষ্ণ মাংস আর মেদ;"

বিনয় মজুমদারকে "ফিরে এসো চাকা"র কবি হিসাবে সাধারণ পাঠকসকল মনে রেখেছে। কিন্তু তাঁর সৃষ্টিসম্ভার বেশ ওজনদার। প্রতিভা ও মেধা অনস্বীকার্য। কুড়িটা কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও প্রবন্ধ গ্রন্থ, ছোট গল্প, গণিত শাস্ত্র বিষয়ে তিনটি বিখ্যাত বইয়ের লেখক তিনি। তিনি একজন খ্যাতিমান গণিতজ্ঞ। কবিতাকেও তিনি গণিতের হিসাবে ফেলতেন। কবিতা ও গণিতকে একসূত্রে বাঁধতেন। তিনি জীবনবোধকে ধারণ করে কোলাহলের জীবনকে বিসর্জন দিয়েছিলেন। প্রাকৃতিক নির্জনতাকে বেছে নিয়ে একাকী বাস করতেন। কলকাতার নাম যশ খ্যাতির কামড়াকামড়ি, দলাদলি থেকে দূরে সরে গিয়ে উত্তর চব্বিশ পরগণার ঠাকুরনগর শিমুলপুর "বিনোদিনী কুটীরে" নিভৃতে, চুপচাপ একাকী কাটিয়ে গেলেন। অনুমান করতে কষ্ট হয় না তিনি উপেক্ষিত ছিলেন। প্রচারের পাদপ্রদীপের আলোয় থাকতে তাঁর পছন্দ নয়, সে যেমন সত্য, তেমনি এও সত্যি যে তাঁকে উপেক্ষার অভিমানে জীবনের স্বাভাবিকতা থেকে ছিটকে পড়তে হয়েছে। কষ্ট ও দারিদ্রের সঙ্গে চিরকাল বসবাস করতে হয়েছে। একটা কথা চাউর হয়ে আছে যে, গায়ত্রী চক্রবর্তীর প্রতি তাঁর আসক্তি, একতরফা প্রেম ও গায়ত্রীর প্রত্যাখ্যান তাঁকে অভিমানের চূড়ান্ত সীমায় নিয়ে গিয়েছিল। কবিতায় তিনি শিখেছিলেন –

"আমরা দুজনে মিলে জিতে গেছি বহুদিন হলো।
তোমার গায়ের রঙ এখনো আগের মতো, তবে
তুমি আর হিন্দু নেই, খৃষ্টান হয়েছো।
তুমি আর আমি কিন্তু দুজনেই বুড়ো হয়ে গেছি।
আমার মাথার চুল যেরকম ছোটো করে ছেঁটেছি এখন
তোমার মাথার চুলও সেইরূপ ছোটো করে ছাঁটা,
ছবিতে দেখেছি আমি দৈনিক পত্রিকাতেই; যখন দুজনে
যুবক ও যুবতী ছিলাম
তখন কি জানতাম বুড়ো হয়ে যাব?
আশা করি বর্তমানে তোমার সন্তান নাতি ইত্যাদি হয়েছে।

আমার ঠিকানা আছে তোমার বাড়িতে,
তোমার ঠিকানা আছে আমার বাড়িতে,
চিঠি লিখব না।"

আমরা একত্র আছি বইয়ের পাতায়।

সঙ্গোপন প্রেম সারাজীবন হৃদয়ে আগলে রাখলেও সে বিষয়কে তাঁর কাব্য ও অন্যান্য প্রতিভা ও সৃজনশীলতা থেকে আলাদা করে বিবেচনায় নিতে হবে। সেসব নয়, তাঁকে আলাদা করে ফেলা হয়েছিল। তাঁকে উপেক্ষা করা হয়েছে। আনন্দবাজার পত্রিকার স্বনামখ্যাত ফটোগ্রাফার অশোক মজুমদার দেশের সময় নির্মিত পার্থসারথী নন্দী পরিচালিত বিনয় মজুমদার বিষয়ক তথ্যচিত্রে জানিয়েছেন, এমন কি নব্বই দশকেও কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ও দীপক মজুমদার প্রমুখের নিকট বিনয় মজুমদার সম্পর্কে শুনে তাঁর কবিত্ব শক্তির পরিচয় তিনি জেনেছিলেন। কিন্তু সেসময়েও সাধারণ্যে, এমন কি কবিতা মহলেও তাঁর সম্পর্কে আলোচনা হতে তেমন শোনেননি। পত্রিকায় যতোটা খবর বিনয় সম্পর্কে প্রকাশিত হতো, সেসবের কারণ তাঁর কবিত্ব নয়, তাঁর অসুস্থতা, হাসপাতালে থাকার খবর। কবি বিনয় মজুমদার স্কিৎজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁর সে চিকিৎসাই হয়নি। তাঁকে পাগল সাব্যস্ত করা হতো। এমন কি তাঁকে ওই অবস্থাতেও ২৮ বার ইলেকট্রিক শক দেয়া হয়েছে। তাঁর হাত দুটি সারাক্ষণ কাঁপত। সে অবস্থাতেও তিনি হাসপাতালের বেডে থেকে লিখেছেন হাসপাতালে লেখা কবিতাগুচ্ছ। জীবন সায়াহ্নে এসে ২০০৫ সালে তাঁকে এই গ্রন্থ রচনার জন্যে আকাদেমি পুরস্কার প্রদান করা হয়। একই বৎসরে তাঁকে কাব্যসমগ্র ২ (কবিতা) এর জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার দেয়া হয়। যদিও বিনয় মজুমদারের মতো প্রতিভাবান কবি ও গণিত শাস্ত্রবিদ, যিনি লগারিদমের অন্য সূত্র আবিস্কার করেছিলেন, এইসব পুরস্কারের তোয়াক্কা করেন না, তেমন কোন বিশেষ মূল্যও এসবের তাঁর কাছে নেই, তবুও নির্দ্বিধায় বলা যায় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে অবহেলাই করেছেন। যথাসময় ও যথাযথভাবে তাঁর মূল্যায়ন করা হয়নি।

সাম্প্রতিক সময়ে তাঁকে নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। আগ্রহ তৈরী হচ্ছে অগ্রসর পাঠকদের মধ্যে তাঁকে পড়ার। এ যেন অবশ্যম্ভবী। এ হওয়ারই কথা ছিল যেন! কবি বিনয় মজুমদার তাঁর কবিত্ব শক্তি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি তাঁর সৃষ্টির ক্ষমতা জানতেন। তাইতো ষাটের দশকের কলকাতায় কবিদের "আরও কবিতা পড়ুন" আন্দোলনে যখন সকল আড্ডা, কফি হাউজে আলোচনার বিষয় সাহিত্য, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোর সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তরুণরা তখন পাঠক আকৃষ্ট করতে কবিতা আওড়ায়, তখন তরুণ কবি বিনয় মজুমদার বলে ওঠেন,

"আমি এখন যা লিখছি সে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক। তাঁর মানে ভবিষ্যতে আমার কবিতা ছাত্র ছাত্রীরা পড়তে বাধ্য হবে। সেহেতু আমার এখন কোন পাঠক না হলেও চলবে।" কতোটা আত্মবিশ্বাসের উপর দাঁড়ালে এমন স্পর্দ্ধিত উচ্চারণ সম্ভব? তাঁকে অনেকেই কবি জীবনানন্দের কবি প্রতিভাই শুধু নয়, জীবন যাপন ও মৃত্যুত্তোর জীবনের সঙ্গেও তুলনা করে থাকেন। জীবনানন্দের মতোই নির্জনতা ও প্রকৃতির অপার রহস্য ও সৌন্দর্য্য তাঁকে আকৃষ্ট করেছে, নিজের কাছে টেনে নিয়েছে। দুজনেই চন্দ্রভূক ছিলেন। রাতের আকাশের তারাদের সাথে কথা বলতেন। জীবদ্দশায় অবহেলার শিকার হয়েছেন। মৃত্যুর পর পুনরাবিষ্কৃত হয়েছেন। মৃত্যুর পর যতদিন যাচ্ছে তত তাঁরা দুজনেই পুনর্মূল্যায়িত হচ্ছেন। শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জন করছেন।

বিরল ব্যতিক্রমী কবি বিনয় মজুমদারকে নিয়ে দেশে-বিদেশে গবেষণা হচ্ছে। ২০২১ সালে ঢাকা থেকে এহসান হায়দার ও স্নিগ্ধদীপ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় আশ্রয় প্রকাশন প্রকাশ করেছে ৮২৪ পৃষ্ঠার এক অসামান্য দালীলিক গ্রন্থ। বিনয় মজুমদারের জীবন ও কর্ম বিষয়ক সমৃদ্ধ এ প্রকাশনায় নতুনভাবে বিশ্লেষণ করেছেন অগ্রজ ও সমকালীন গবেষক ও প্রাবন্ধিকগণ। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কবি, ইঞ্জিনীয়ার বিনয় মজুমদারের জীবন, কবি প্রতিভা, গণিত শাস্ত্রে জ্ঞান ও

অবদান বিষয়ে নতুন করে বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও এ বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তর গবেষণা ও আলোচনা হচ্ছে। সুদীপ সিংহের রচনা ও নির্দেশনায় মঞ্চে এসেছে "বিনয়ের জীবন" (উপেক্ষিত কবি বিনয় মজুমদারের কাহিনী), এই নাটকে বিনয় মজুমদারের জীবন, প্রতিভা, তাঁর প্রতি অবহেলা, তাঁর সঠিক চিকিৎসা না হওয়া, পাগল হিসাবে চিহ্নিত করে ২৮ বার ইলেকট্রিক শক প্রদান করা, যথাযোগ্য সম্মান না দেয়া, কবি জীবনান্দের সাথে তাঁর জীবন চরিতের সাদৃশ্য অনুসন্ধান করা ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। পার্থ সারথী নন্দী পরিচালিত দেশের সময় নির্মিত তথ্যচিত্রে কবি সুবোধ সরকার বলেছেন তিনি তাঁকে চোখে দেখেননি। তাঁর "অঘ্রাণের অনুভূতিমালা" পড়ে তাঁর মনে হয়েছে তাঁর কবিতা তাঁর (সুবোধ সরকারের) সর্বাঙ্গ জড়িয়ে আছে। "ফিরে এসো চাকা" সম্পর্কে বলেছেন, "বাংলা ভাষায় দ্বিতীয়টি আর লেখা হয়নি, যা একই সঙ্গে অতীত ও বর্তমানকে ধরে আছে। তাঁকে নিয়ে অনেক মিথ আছে। তিনি শুধু বাংলার নয়, সমগ্র উপমহাদেশের সকল ভাষার কবি। পঞ্চাশ বা ষাট দশকের কবিতা হয়েও সেসব ২০২১ সালে এসেও সমান প্রাসঙ্গিক। তাঁর কবিতার হয়তো সামাজিক ভূমিকা ছিলনা, তিনি ছিলেন অন্তরের গভীরতার কবি। বাইরের কোন কিছু, যেমন সোমালিয়া বা ভিয়েতনামের কথা সরাসরি তাঁর কবিতায় অনুপস্থিত! তিনি হয়তো তারিখ বলেন না, সময়কে ধরে বলেন না, তবে তাঁর কবিতায় সমকালের এক গভীর বাস্তবতার যোগ আছে। তিনি আকাশের কবি নন। দুর্নিরীক্ষ্যের কবি নন। শেষ পর্যন্ত একজন কবি। মাটির কবি, মাটি ছুঁয়ে থেকে আকাশ স্পর্শ করে। বিনয় মজুমদার সেই সারসের মতো, মানুষকে দেখে যে সারস আকাশে উড়ে যায়, কিন্তু যার ছায়া আমাদের সবার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়।"

কবি বিভাস রায় চৌধুরী বলেন, গল্প উপন্যাসের মতো কবিতা একবার পড়েই ফুরিয়ে যায় না। কবিতার মধ্যে অনেক সংকেত থাকে, অনেক গভীর দেখা থাকে, ভবিষ্যতের জন্যে বলা অনেক কথা থাকে, সেগুলি ফিরে ফিরে আসতে থাকে। গুহালিপির পুরনো ভাষা নতুন করে এখন যেমন পড়তে পারছি। বিনয় মজুমদার গণিতের দৃষ্টিভঙ্গীতে কবিতা লিখতেন। তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণির কবি, ঠিক তেমন প্রথম শ্রেণির গণিতজ্ঞ। এমনটি দেখা যায়না। তাঁর কবিতার পরতে পরতে রহস্য। যেন রহস্য ফুরোলেই সব শেষ। কবি নিজেই বলেছেন, "আমি লজেন্সের মতো কামড়ে খাইনা, ক্রমে রসাস্বাদন করি।" এভাবেই রসাস্বাদনে অমরত্বের পথে চলেছেন। বিভাস রায় চৌধুরী কবি বিনয় মজুমদারকে জনপদের আরেক দেবতা বলে অভিহিত করছেন।

আনন্দবাজার পত্রিকার বিখ্যাত ফটো জার্নালিস্ট অশোক মজুমদার তাঁর কর্মজীবনে অনেক বিখ্যাত, জনপ্রিয়, মেধাবী কবির সংস্পর্শে এসেছেন। মত বিনিময় করেছেন, কাছে থেকে জেনেছেন। কবি বিনয় মজুমদার সম্পর্কে সুনীল গাঙ্গুলি, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবনদের কাছ থেকে যতোটা শুনেছেন, নিজে তাঁর সংস্পর্শে এসে যা দেখেছেন এবং তাঁকে পড়ে যেমন জেনেছেন, তিনি নির্জন একটা দ্বীপের মধ্যে বাস করতেন। ওইরকম একটা দ্বীপে যেতে হলে অঘ্রাণের অনুভূতিমালা, ফিরে এসো চাকা, নক্ষত্রের পতন পড়লে বোঝা যাবে উনি কি ধরণের চর্চা করেছেন। তাঁর কবিতাকে বুঝতে হলে ওই দ্বীপে যেতে হবে, ওঁর কবিতা পড়তে হবে। অশোক মজুমদার যথার্থই মনে করেন যতদিন কবিতা থাকবে, ততদিন –

"একা একা কথা বলি" এই কথাগুলি থাকবে। এই কবিতাগুলি সত্যিই বেঁচে থাকবে।

আমাদের বোধ ও অভিজ্ঞতার সীমানা বিস্তৃত হচ্ছে। আমরা বোধ হয় বিনয় মজুমদারকে পড়তে পড়তে তাঁর কাব্যচর্চার নিভৃততম সেই দ্বীপে পৌঁছে যেতে পারছি ক্রমশ। অন্তত নতুন করে বিনয় মজুমদার পড়ার উৎসাহ ও ক্ষেত্র তৈরি সে সংকেত আমাদের দিচ্ছে! এবার আমরা হয়তো ভিতরের রহস্যভেদে কবির ভাবনার রেশ ধরে বলতেই পারি –

"উড়ে গেছো, ফিরে এসো, ফিরে এসো, চাকা,
রথ হয়ে, জয় হয়ে, চিরন্তন কাব্য হয়ে এসো।"

অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়

মেজদার হোটেল

কমলকুমার মজুমদার – এক ইউরোপীয় ব্রাহ্মণকে ফিরে দেখা

হাওড়ার ছোট কারখানা ঘেরা সন্ধ্যেবেলা। তার মাঝে কদমতলা নটবর পাল রোডের মোড়ে মেজদার হোটেল। বহুদিন পরে মেজদার হোটেলে আবার আড্ডার জমায়েত হয়েছে। অনেকদিন পরে আবার কথায় কথায় সমরেশ বসুর লেখা এসে গেল। সমরেশ বসু বাজার চলতি বা মেইনস্ট্রিম সাহিত্য পত্রিকার শুধু উজ্জ্বল নয় সবচেয়ে পপুলার লেখক ছিলেন অথচ প্রবলভাবে ব্যতিক্রমী লেখক। সমরেশকে বাদ দিলে, পঞ্চাশের ষাটের সময়টায় মেইনস্ট্রিম গদ্যসাহিত্যে বিভুতি – সুবোধ – জ্যোতিরিন্দ্র – বুদ্ধদেবের উপস্থিতি প্রবল। তারাশঙ্কর ম্রিয়মান। মানিক গত হয়েছেন কয়েক বছর। তারও কয়েক বছর আগে বিভূতিভুষণ। মানিক কিন্তু স্টেজ থেকে বিদায় নিয়েও তাঁর দাপটের ঢেউ নিয়ে সিরিয়াস পাঠকদের মাঝে প্রবলভাবে বিরাজমান। মানিক ঘরানা গদ্যকাররা তখন বাংলা সাহিত্যের ভাষাকে কত নিরাভরণ করেও সজীব রাখা যায় তার চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু এব্যাপারে, বামপন্থী ধারার দু'একজন ছাড়া বাকিরা খুব যে সফল হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। বরঞ্চ গৌরকিশোর ঘোষ, নিরাভরণ ভাষায় অনেকটা সফল ছিলেন। আর সমরেশের উল্টো প্রান্তে নাগরিক বা আর্বান বিদগ্ধমহলে তখন বুদ্ধদেব বসু মান্যতা পাচ্ছেন। বুদ্ধদেব বসু ছিলেন একদম টিপিক্যাল অধ্যাপক সাহিত্যিক। বিলিতি কাঁচের সেগুন কাঠের ভিক্টোরিয়ান জানলা দিয়ে বাইরের জগৎ দেখেন।

কিন্তু সমরেশের দ্বিতীয় জগৎ বা কালকূট নামে যে সাহিত্যের জগৎ সেখানে তাঁর টেবিলের উল্টোদিকে কেউ ছিলেন না। তিনি একাকি বিরাজমান ছিলেন। প্রধানত কালকূট নামে যেসব লেখা বেরিয়েছে তার দুনিয়ায় উনি কোথায় পাঠক কে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন ? কিছুটা বাঙলা-বিহারের জঙ্গলের দিকে চোখ ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের – বিভুতিভূষনের উত্তরসূরি হিসেবে। কালকূটের বড়দিকটা কিন্তু শেকড়ের কাছে যাওয়ার রাস্তা। শহুরে মধ্যবিত্তকে বাঙলার চাষাভুষো মানুষের সংস্কৃতি ঐতিহ্যের কাছে নিয়ে যাওয়া। সমরেশ জানতেন, বাঙালি মধ্যবিত্তের জন্ম বেড়ে ওঠা সবই কলোনিয়াল নব্য আপার কাস্ট ছাঁচের মধ্যে। এই মধ্যবিত্তকে বাঙলার নিম্নবর্গের মানুষের সংস্কৃতির কাছে টেনে শেকড়ের কাছে নিয়ে যাবার চেষ্টা। এখন যাদের আন্তোনিও গ্রামশির অনুসরণকারীরা সাব অলটার্ন বলেন সেই চাষাভুষো সমাজের লৌকিক ঐতিহ্যের আর সেই সমাজের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন।

সেদিন মেজদার দোকানের আড্ডা, শেকড় কাকে বলে, বাঙালীর শেকড় কি, সেদিকে গড়ীয়েছিল। নিজের ঐতিহ্যর দিকে ফিরে দেখাকে বলতে কি বুঝবো ?

এতক্ষণ মেজদা দোকানের কাজে হেল্পিং হ্যান্ডদের সঙ্গে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। হাত মুছতে মুঝতে বললেন, "বাঙালীর শেকড় কি ? সবাই কি একই শেকড়ের খোঁজে ঘোরে ? সব বাঙালী এক শেকড়কে নিজের ঐতিহ্য ভাবে না। ধরো একজন আপার কাস্ট, পূর্ব বাঙলায় জমি বাড়ি ফেলে এসেছে। তার ফেলে আসা ধানের মরাই, চকমেলানো দুর্গামন্ডপ তার ঝাড়লণ্ঠনের মধ্যে ঐতিহ্যের স্মৃতিকে খুঁজছেন। আর যে অল্পবয়সী যুবক বা তরুণ, বর্ডারের বেরা টপকে এপারে এসে তপশিয়ার কোহিনূর মার্কেটে কাবাবে দোকানে কাজ করছে তার ঐতিহ্যে আছে ফেলে আসা নদীর পাড়-মাজার-মানিকপীরের গান। কিংবা পুরুলিয়ার যে ছেলেটা পেটের দায়ে বোম্বের ধারাভির ইডলির ট্রলি-দোকানে হেল্পারের কাজ করছে তার ঐতিহ্য, সংস্কৃতির শেকড় এক হতে পারে না। সে মোরাং বুরু, শিবের গাজন, ধর্মঠাকুরের মেলার মধ্যে তার স্মৃতির শেকড়কে খোঁজে। আবার অনেক লেখক নিজের স্মৃতি নয়, নিজের চর্চিত জগতের মধ্যে দিয়ে অর্জিত স্মৃতি, পূর্বপুরুষের মুখের কথা বা ওরাল হিস্ট্রির মধ্যে ঐতিহ্যকে খুঁজেছেন। এ খোঁজা হারিয়ে যাওয়া মরা গাছের শেকড় খোঁজার মত। এইরকম স্মৃতির জগতের উপন্যাসকার ছিলেন কমলকুমার। জটিল চিন্তার লেখক ছিলেন

কমলকুমার মজুমদার। ছোটগল্পে, প্রবন্ধে অন্যমানুষ ছিলেন। কিন্তু ঐতিহ্যের ইতিহাসের প্রশ্নে সমরেশের উল্টো প্রান্তে আছেন কমলকুমার মজুমদার। স্মরেশ গেছেন বাঙলীর সংস্কৃতিকে চেনাতে, কমলকুমার তখন বাঙলার ব্রাহ্মণ সংস্কৃতি সম্পৃক্ত জগতের শিল্পের মাঝে পাঠককে বাঙলা ঐতিহ্যকে চেনাতে চেয়েছিলেন। একটা কথা মনে রাখতেই হবে, সেটা হোল বাঙালী মধ্যবত্তিরের জন্মই দেড়-দুশো বছর আগে। বা কলোনিয়াল সোশিও কালচারাল আঁতুড় ঘরে। কিন্তু তাঁদের আদি ইতিহাস ছিল স্মৃতিশাস্ত্র ভারাক্রান্ত আপার কাস্ট সংস্কৃতিতে। এই মধ্যবিত্তের বড় আশ্রয় রামকৃষ্ণ ভক্তি আন্দোলন। কমলকুমার এই মধ্যবিত্তকে তার ঐতিহ্যকে চেনাতে চেয়েছিলেন।"

পরের দিনই আমাদের হাতে এসেছিল একটা ছোট্ট বই, লাল রঙের মলাট, বার করে বলেছিল, "এরকম বই আগে পড়িনি, তোমরা শোন। এই বলে থেকে রিডিং পড়তে শুরু করেছিল।"

"আলো ক্রমে আসিতেছে। এ নভোমণ্ডলে মুক্তাফলের ছায়াবৎ হিম নীলাভ। আর অল্পকাল গত হইলে রক্তিমতা প্রভাব বিস্তার করিবে, পুনর্বার আমরা, প্রাকৃতজনেরা, পুস্পের উষ্ণতা চিহ্নিত হইব। ক্রমে আলো আসিতেছে।

অনতিদূরে উদার বিশাল প্রবাহিণী গঙ্গা, তরল মাতৃমূর্তি যথা, মধ্যে মধ্যে বায়ু অনর্গল উচ্ছসিত হইয়া উঠে, এই স্থানে, বেলাতটে বিবশকারী উদ্বিগ্নতা ক্ষুদ্র একটি জনমণ্ডলীকে আশ্রয় করিয়া আছে।"

উপন্যাসের নাম "অন্তর্জলী যাত্রা"।

একটি "নবাঙ্কুর" নামে অখ্যাত লিটল ম্যাগাজিনে "অন্তর্জলী যাত্রা" উপন্যাসটি বেরিয়েছিল, ১৯৫৯ সালে, কমলকুমারের বয়স তখন ৪৫।

উপন্যাসে প্রধান চরিত্র তিনটি। চণ্ডাল (ডোম বৈজুনাথ), গঙ্গা প্রাপ্ত হতে চলেছে এমন এক মৃতপ্রায় কুলীন ব্রাহ্মণ ও নবযৌবনা ব্রাহ্মণ কন্যা, যশোমতী। যশোমতীর সঙ্গে মৃতপ্রায় গঙ্গাযাত্রী কুলীন ব্রাহ্মণের বিবাহ হয়, গঙ্গাতীরে। যশোমতীর পিতার কুলরক্ষার্থে। সহমরণ সতীদাহ কথা হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। সময়কাল ১৮৩০-৫০ সালের কোন এক সময়ের গন্ডগ্রাম, যেখানে ফোর্টউইলিয়াম-হিন্দু কলেজ ঘরানার নব্যবঙ্গের আঘাত পড়েনি। যদিও সহমরণ যে সরকার বাহাদুর আইন করে বন্ধ করেছে, সে খবর এই গ্রামে পৌঁছেছে। স্থান গঙ্গা তীরবর্তী মহাশ্মশান।

সেদিন সেই শহরতলীর সন্ধ্যেবেলায় মেজদার হোটেলের ডুম আলোর তলায় আমরা কমল মজুমদার নামক ঘুর্ণাবর্তে ঢুকেছিলুম।

আখ্যানের মাঝপথে এসে বোঝা যায় পাঠক হিসেবে আপনি অন্তর্জলী যাত্রা গোটা উপন্যাসটি বা আখ্যানটিতে প্রচলিত realism বা গল্প বলার structure নেই। অথচ কোনো কোনো ঘটনার আশ্চর্যময় details পাবেন।

যশোমতী ঐতিহ্যবাহী প্রথার প্রতি নিঃশর্তে শ্রদ্ধাশীলা। সহমরণে সম্পূর্ণ সম্মত ও স্থিত। অন্যদিকে স্বাভাবিক জীবনের নিয়মে যশোমতী, বৈজুর বীর্যবান শরীরের দিকে আকৃষ্ট। যশোমতী যখন নিজেকে সহমরণের প্রার্থিনী ভাবছে, কমলকুমারের ভাষায় তার রূপকল্প গড়ে উঠছে – "যশোমতীর দৃষ্টিপথে, মানস চক্ষে সতীদাহ অনুষ্ঠান ভাসিয়া উঠিল। ..... চতুর্দোলার আসনে যজ্ঞবাট করা হইয়াছে, চারিভিতে ছোঁড়া কদলীবৃক্ষ লাল সুতা দিয়া গণ্ডীবদ্ধ, উপরে মালাকার মেঢ় ঝুলাইতে ব্যস্ত, প্রতিটি মেঢ়ে দশমহাবিদ্যার এক এক রূপ আলেখ্য, শেষ কয়েকটি মালাকারের ছেলেরা আঁকিতেছে, তাহাদের বধূরা ফুলমালা গাঁথে, ধান্য কঙ্কন, খৈয়ের সাত নহর তৈয়ারি হয়। ..... সিন্দুর বিক্রেতা গেরী মাটিতে লা মিশাইয়া ভাটি বসাইয়াছে। নূরীরা রুলী গড়ে, তাঁতিরা এবং কাপালিরা সূতা কাটিয়া আলতায় রঙ করিতেছে, ছুতার আপন মনে তুলসিমালা গাঁথিতে ব্যস্ত; বাটাদার কড়ির পাহাড় করিয়াছে; লোয়াদার বাতাসাওয়ালারা একদিকে বাতাসা কাটিতেছে। ..... অভিজাত গৃহের রমণীরা তাঁহাকে সাজাইতে ব্যস্ত, তাঁহারা আপন আপন গৃহ হইতে প্রসাধন সামগ্রী আনিয়াছেন, গোলাপ-পাশে সূক্ষ কারুকার্য, দর্পণের পিছনে কলাইকৃত প্রসাধনরত রাধা প্রতিমা, জড়োয়া সুখপক্ষী অঙ্কিত কাজললতা। স্বর্ণভৃঙ্গার হইতে তাঁহাকে উম্মল-পানি দেওয়া হইতেছে, তিনি সহাস্যবদনে তাহা পান

করিতেছেন, এবং তাঁহার চক্ষু আরক্ত। নিকটে বন্ধ-চিত্র জাঁতি দিয়া একজনা গুবাক কাটিতেছেন। জাঁতির সুরত ক্রীড়ারত স্ত্রী-পুরুষের হেবজ্র হাস্য, যশোমতী ইদানীং সাক্ষাৎ চম্পক ঈশ্বরী। তিনি যেন লক্ষ্মীমূর্তি, এক হস্তে প্রস্ফুটিত পদ্ম, কখনও বা দেখিলেন পঞ্চ পল্লব অন্য হাতে বরাভয়। কত যে শাখা তাঁহার পায়ে লাগিতেছে, সিন্দুর পড়িতেছে। তিনি দৌড়াইয়া চিতায় উঠিলেন ..... অগ্নি সংযোগ করা হইল, শাঁখা কড়ি স্বর্ণালঙ্কার উড়িল। ..... যশোমতী নিজেকে রামপ্রসাদের বেড়া বাঁধার দড়ি যোগান দেওয়া শ্যামা মা ভাবে (ভাবিষ্ট)।"

ইচ্ছে করেই দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি দেওয়া হলো, কমলকুমারের সাহিত্যের নিদর্শন হিসাবে। সহমরণের এরকম ডিটেল বর্ণনা পাঠক এর আগে পাননি। এমনকি মহাভারতে মাদ্রীর সহমরণের বর্ণনাতে এত ডিটেল পাওয়া যায় না। কমলকুমার তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য, কল্পনার ক্ষমতা এবং নিজস্ব ভাষা নিয়ে হাজির হলেন। পাঠক লক্ষ্য করেছেন, ভাষা ঊনবিংশ শতাব্দীর আবেশ তৈরির আধার হয়ে উঠেছে। অথচ সমগ্র রূপকল্পটিতে অবধারিত ভাবে চলিত শব্দ ব্যবহার করেছেন। ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির দুই দিককে দেখার জন্য কি ? একদিকে সংস্কৃতিজ্ঞ প্রাচীন প্রথা। অপর দিকে ব্রাহ্মণীজগতে প্রাকৃত বা সাবেকী বাংলার প্রতিনিয়ত প্রচলন। এই দুয়ের সমান্তরাল ব্যবহার, ভাষায় এক মন্থন সৃষ্টি করেছে। কমলকুমারের বিদেশী সাহিত্যের বা সাহিত্যের ভাষা সম্পর্কে নিবিড় ওয়াকিবহাল থাকার এ এক চিহ্ন। তিনি পুরাতন জাতিকে, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে, ধরতে চাইছেন। অনেক সময়েই বিভক্তির ব্যবহার নেই। নাম ধাতু ব্যবহারের চেষ্টা অবিরত। এ লেখা যত্নশীল পাঠকদের জন্যে। সপ্তমী কি নবমী পূজার দিন ভাত-ঘুম পরবর্তী বাজারি শারদীয়া উপন্যাস পড়ুয়াদের জন্য নয়। আরো একটি উল্লেখযোগ্য দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেল। সহমরণকে উচ্চবর্ণজাত প্রথাকে রোম্যান্টিক মোড়কে পেস করা হল। সহমরণের সোশ্যাল ইকনমিকস সযত্নে অবহেলা করা তো হলই। বীভৎসতা ও কদর্যতাকে এক পৌরানিক স্বপ্নিল প্রথায় পরিবেশিত হল। এবং "কমলকুমার" – এই মিথটি গড়ার ছাঁচটিও তৈরি হলো।

অথচ এই আখ্যানে বৈজু চাঁড়াল (ডোম শব্দ তখন পাইক বরকন্দাজদের জন্য ব্যবহার হত) প্রবল ভাবে তাঁর নিচুতলার ভাষা নিয়ে উপস্থিত। পাঠক লক্ষ্য করবেন, বৈজুকে realistic করেননি। একটি কারণ হতে পারে চাঁড়াল সমাজের ওপর তাঁর অভিজ্ঞতা কম ছিল। আবার অন্য ভাবে দেখলে বোঝা যায় এই উপন্যাসে Classical European নভেলের structure বা বিন্যাসকে পরিহার করা হয়েছে। এ যেন গদ্যে কৃষ্ণলীলার বা পুরান-কবি-কাহিনীর স্টাইল নেওয়া হয়েছে। এমনকি কবিকঙ্কণী লোক-ধার্মিক রিয়ালিজম কেও পাশ কাটানো হয়েছে। লেখায় structureএ নিজের সীমাবদ্ধতাকে সুন্দর ভাবে উহ্য রাখা হয়েছে। ফলে সীমাবদ্ধতাকে স্বাভাবিক মনে হয়। সেদিন সন্ধ্যেবেলা অনেকদিন পর আমরা রিডিংপড়ার-রিডিং শোনার মধ্যে দিয়ে কমলকুমার মজুমদারের অনাস্বাদিত জগতের কাছে এসেছিলুম। আস্তে আস্তে বুঝতে পারছিলুম পঞ্চাশ ষাটের দশকে সমরেশ বসুর উলটো জগতের এক বড়মাপের গদ্যকার ছিলেন কমলকুমার। যদিও সমরেশ বসুর সঙ্গে তুলনা হয়না। কলকাতার সাহিত্যজগতের প্রধান ধারার অন্যতম বড় খুঁটী ছিলেন সমরেশ। মেইনস্ট্রিম বাজারের প্রধান খুঁটি। প্রতি পুজোসংখ্যায় একাধিক উপন্যাস ছাড়াও নামকরা লিটল ম্যাগাজিনদেরো সমরেশ খুশী রাখতেন। সারা জীবনে সমরেশ এবং কালকূট নামে আড়াইশোর মত উপন্যাস তাঁর ক্ষেতে ফলেছে। আর কমলকুমার কোনদিন মেইনস্ট্রিমের জন্যে লেখেননি। খাঁটি লিটল ম্যাগাজিন লেখক ছিলেন। সমরেশের মত কখনই সাহিত্য জীবনধারনের উপায় বা পেশা হিসেবে নেননি। এছাড়া পন্ডিত মানুষ হিসেবে অনেক বেশি পরিচিতি লাভ করেছিলেন, ফলে প্রাবন্ধিক হিসেবেও অনেক লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকের আবদার-অনুরোধ মিটিয়েছেন। তাও সাকুল্যে তিন ভল্যুমে সব লেখা ধরে গছে। অথচ এই সময়টা যখনও সুনীল শীর্ষেন্দু প্রবল বন্যা ইয়ে বাংলা গদ্যে আস্নি। তখন সাধারণ পাঠকের কাছে সমরেশ, মেইন্ট্রিমের তন্নিষ্ঠ পাঠকের কাছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী আর লিটল ম্যাগাজিনের পাঠকের কাছে কমল মজুমদার। এরকম একটা মিথ কলেজ স্ট্রিট জন্ম দিয়েছিল। সমরেশের সঙ্গে পার্থক্য ছিল আরো গভীরে। সমরেশ ছিলেন সামাজিক জগতের চিত্রকর। ঐতিহাসিক উপন্যাসেও অর্থনীতি, সামাজিক ইতিহাস এসেছে। অন্যদিকে কমলকুমার প্রাচীন পুরান-ইতিহাসকে লেখার উপজীব্য করেছেন।

পঞ্চাশের যে আবহাওয়ার কথা শুরুতে আমরা আলোচনা করছিলুম সেই বাজারের মাঝে, নবাঙ্কুরের মত একটি অখ্যাত পত্রিকায় "অন্তর্জলী যাত্রা" বেরিয়েছিল। "নবাঙ্কুর" হারিয়েও গেছে বহুবছর আগে। স্বাভাবিক নিয়মে প্রতিষ্ঠা পাওয়া কিংবা পাঠক সমাজে উপস্থিত হওয়া (আজকের ভাষায় arriving) হয়নি। অল্প কিছু বিদগ্ধ মানুষ, মননশীল পাঠক আস্তে আস্তে এই উপন্যাস সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা শুরু করেছিলেন। কমলকুমার কিন্তু অখ্যাত অনামী ছিলেন না। কলকাতার সুধীমহলে, intellectual জগতে এক উজ্জল উপস্থিতি তাঁকে অতি পরিচিত করে রেখেছিল। কমলালয় স্টোরস, কফি হাউস বা খালাসীটোলায় নিয়মিত আড্ডায় সত্যজিৎ রায় থেকে সিগনেট প্রেসের দিলীপ গুপ্ত, হরিসাধন দাশগুপ্ত থেকে অশোক মিত্র (ICS) ইত্যাদিরা উপস্থিত থাকতেন। এই সমাবেশে তিনি মধ্যমণি হয়ে থাকতেন। সর্বত্র তিনি মুখ্য ভূমিকা নিতেন। ফলে তাঁর লেখা শারদীয়া আক্রান্ত জনগণের নজর না কাড়লেও, একটু ধীরে হলেও, বিধগ্ধ তন্নীষ্ঠ পাঠকমহলে স্বীকৃতি পেতে সফল হয়।

অনিমেষ চট্টোপাধ্যায় – সত্তরের দশকে ছাত্রজীবন কাটিয়েছে। ওই দশকের ভালো খারাপ সবই তার মধ্যে আছে।বর্তমানে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে লেখালিখিতে ব্যস্ত থাকতে চায়। সাহিত্য,সামাজিক ইতিহাস-অর্থনীতির প্রবন্ধ আর ছোটগল্পর জগতে বিচরণ করতে চায়।

স্বাগতা চট্টোপাধ্যায়

গঙ্গোত্রীর যাত্রাপথে

অনেকক্ষণ ধরে গোঁ গোঁ শব্দে চড়াই ভাঙছিল আমাদের সুইফট্ ডিজায়ার গাড়িটা। হঠাৎ একটা মোড় ঘুরতেই দূরে চোখে পড়লো বেশ বড়োসড়ো একটা শহর। গাড়ির মধ্যে আমরা তিনজনেই একটু নড়েচড়ে বসলাম।

– ও কৌনসা শহর দিখাই যা রহা হ্যায় ভাইয়া ?

– ওহি হ্যায় উত্তরকাশী ম্যাডাম জি। ড্রাইভার রতন লালের সহাস্য উত্তর।

বাসবী'র বোধহয় চোখটা একটু লেগে এসেছিলো। তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বসে বললো, "এসে গেছি ? স্বাগতা দি?

পেছন ফিরে বলি, "হ্যাঁ রে, আজকের মতো যাত্রা শেষ।"

কিছুক্ষণ আগে থেকেই পাহাড়ের গায়ে অল্প স্বল্প ঘর বাড়ির আভাস পাওয়া যাচ্ছিলো, যাতে বুঝতে পারছিলাম যে কোনো জনপদ এগিয়ে আসছে। এবার আমাদের গাড়ি শহরের মধ্যে ঢুকে পড়লো আর কার পার্কিং-এ পৌঁছে গেলো।

"উতারিয়ে ম্যাডাম, হাম পহুঁছ গয়া উত্তরকাশী মে। বিড়লা গেস্ট হাউস পাশমেই হ্যাঁয়।"

তাকিয়ে দেখি উল্টো দিকেই গেটের উপর লেখা "বিড়লা মঙ্গল নিকেতন"। এখানেই আমাদের ঘর বুক করা। এখন বয়স বেড়েছে। রিস্ক নেবার সাহস নেই। সব জায়গাতেই এবার তাই ঘর বুক করেই এসেছি। গঙ্গোত্রী আমার আগেও বার তিনেক যাওয়া। তাই সাহস পেয়েছি রত্না আর বাসবীকে নিয়ে আবার এ পথে আসার।

ট্রলি স্যুটকেস টানতে টানতে এগোলাম গেস্ট হাউসের দিকে। মনে পড়ে গেলো প্রথমবার ডি. কে. আর আমি গঙ্গোত্রী যাওয়ার পথে যখন উত্তরকাশী তে এসেছিলাম, উঠেছিলাম কাছেই ভান্ডারী হোটেলে। দুনিয়ার ট্রেকারদের ঠেক ছিলো ওটা। রাতেরবেলা ওনাদের কাছে হিমালয়ের নানা অজানা জায়গার গল্প শুনতে শুনতে কেমন যেন নেশা ধরে গিয়েছিলো আমার হিমালয় নিয়ে। তারপর থেকে যখনই কোথাও যাওয়ার সুযোগ এসেছে, মন টেনেছে হিমালয়ের অন্দরমহল।

এবার আমরা তিনজন যাচ্ছি গঙ্গোত্রী। ফেরার পথে অবশ্য হরসিল, চাম্বা, মুসৌরি হয়ে হরিদ্বার। তবে গঙ্গোত্রীই মুখ্য আকর্ষণ।

পথের পরিশ্রমে তিনজনই যথেষ্ট ক্লান্ত। আর ক্লান্ত না হবার কোন কারণও নেই। সেই ভোরবেলা আমরা রওনা হয়েছি হরিদ্বার থেকে। হৃষিকেশ থেকেই যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কাল আমাদের ট্রেনটি লেট করতে করতে হরিদ্বার পৌঁছায় যখন, ঘড়ির কাঁটা তখন এগারোটার ঘরে। অত রাতে হৃষিকেশ যাওয়া সম্ভব ছিলোনা। তাই আমাদের গাড়ি এজেন্সির মালিক শেষপালজি কে সব কথা জানালে উনিই পরামর্শ দেন রাতে হরিদ্বার থেকে যেতে। ওনার গাড়ি ভোরবেলা আমাদের হরিদ্বার থেকেই পিক আপ করে নেবে। নিয়েছিলোও তাই। যাবার পথে হৃষিকেশে শেষপালজির সঙ্গে দেখা করে আমরা রওনা হয়েছিলাম।

কেদারনাথের যাত্রাপথ হৃষিকেশ থেকে লছমণঝুলা হয়ে দেবপ্রয়াগের দিকে গেছে, গঙ্গোত্রীর রাস্তা কিন্তু সেদিক দিয়ে যায়নি। ওটা গেছে নরেন্দ্রনগর, তেহরি হয়ে। রাস্তা খুবই ভালো। গাড়ি প্রথম থেমেছিলো সোজা নরেন্দ্রনগরে।

নরেন্দ্রনগর বেশ জমজমাট শহর। আমরা চা জলখাবার খেয়ে আবার চললাম। পথ গিয়েছে পাহাড়ের গায়ে গায়ে। রাস্তার একপাশে পাহাড় আর অন্য দিকে খাদ।

রত্নাই কথাটা তুললো। "স্বাগতাদি, চুপচাপ বসে না থেকে গঙ্গোত্রীর কথা কিছু বলতো, শুনি। তুমি তো আরও গেছো ওখানে।"

রত্নার কথা শেষ হতে না হতেই গাড়ি থেকে দেখা গেলো দূরে বিশাল নীল জলের বিস্তার। এর আগের বার ২০১০ সালেই দেখে গিয়েছিলাম, তাই বুঝতে পারলাম আমরা এখুনি পৌঁছে যাবো তেহরি ড্যাম এর কাছে।

"গঙ্গোত্রীর গল্প পরে শুনিস, ঐ দেখ তেহরি এসে গেলাম। এখন এই তেহরি ড্যাম এর কথা শোন। জানিস তো এই তেহরি ড্যাম ভারতের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা ড্যাম আর এর উচ্চতা হলো ৮৫৫ ফুট।"

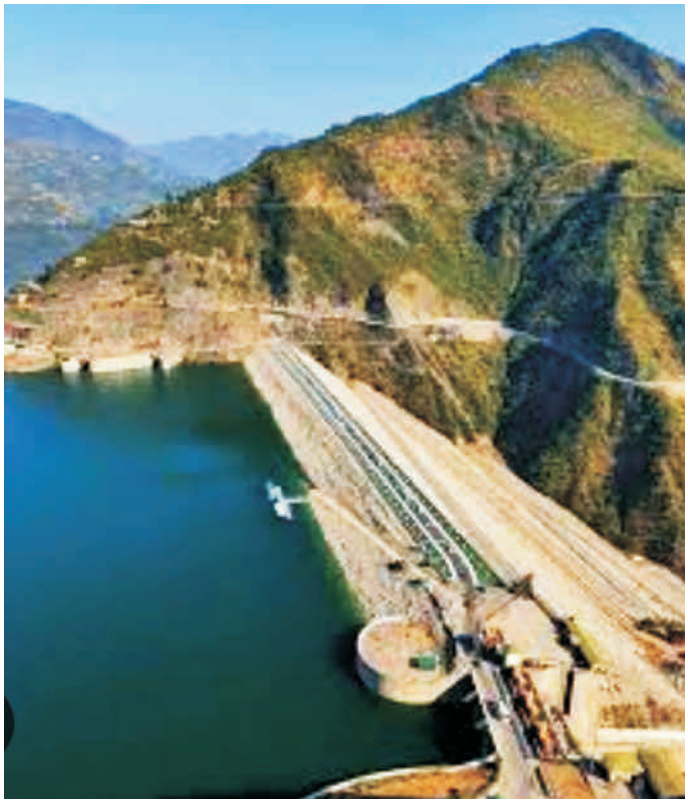

তেহেরি ড্যাম

গাড়ি ততক্ষণে ড্যামের কাছাকাছি হাইওয়ে'র উপর দাঁড়িয়েছে। সবাই নামলাম। এখানে ছবি তো তুলতেই হবে।

"কি অপূর্ব দৃশ্য। কোন নদীর উপর এই বাঁধটা দেওয়া হয়েছে গো?" – বাসবী জানতে চাইলো।

"আরে, এটা সেই ভাগীরথীর উপরেই দেয়া হয়েছে। আমরা যার উৎস মুখে যাচ্ছি। জানিস তো আমরা যাকে গঙ্গা নদী বলি সেটা তিনটি প্রধান নদীর মিলিত ধারা ... কেদার তাল থেকে আসা মন্দাকিনী, শতোপন্থ হিমবাহ থেকে আসা অলকানন্দা আর গোমুখ হিমবাহ থেকে নামা ভাগীরথী।"

তারপর? – দুজনেই একসাথে বলে ওঠে।

"মন্দাকিনী আর অলকানন্দা এসে মেলে রুদ্রপ্রয়াগে আর তখন তার নাম হয় অলকানন্দা। অলকানন্দা আবার দেবপ্রয়াগে এসে ভাগীরথীর সাথে মিশে যায় আর তখন তার নাম হয় গঙ্গা।"

– ম্যাডামজী, চায় পিয়েঙ্গে আপলোগ?

বুঝলাম রতনলালের একটু গলা শুকিয়ে গেছে। আর আমার তো এনি টাইম ইজ টি টাইম। কাছেই দু তিনটি চায়ের দোকান রাস্তার ধারে ঝুপড়ি বেঁধে। এগিয়ে গেলাম আমরাও।

আমার মনে হয়, হিমালয়ের পথে এই ধরনের ভ্রমণে বের হয়ে সফিসটিকেটেড ভাবে ঘুরলে হিমালয়ের ফ্লেভারটা ঠিক পাওয়া যায়না। ঝুপড়ির দোকানে খাওয়া, স্থানীয় দোকানে গিয়ে সেখানকার লোকাল লোকজনের সাথে একটু গল্প গুজব করলে তাদের সংস্কৃতি ইত্যাদির কথা অনেক বেশি জানা যায়। যদিও এটা একান্তই আমার কথা।

আহ, চায়ের গ্লাসে চুমুক দিয়ে আপনা থেকেই গলা দিয়ে বেড়িয়ে এলো।

ভাগীরথীর বুকে বিশাল বাঁধ দেবার জন্য নদীর জল এখানে স্থির। তৈরি হয়েছে এক সুবিশাল লেক। মনে পড়ে গেল শ্রী সুবোধ চক্রবর্তী মশাই এর লেখা ভ্রমণ কাহিনীর কথা।

– বাসবী আর রত্নার দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করি, "যেখানে এই সুন্দর, বিরাট লেকটি দেখতে পাচ্ছিস, ১৯৭৮ সালের আগে সেখানে ছিল একটা বড়ো গ্রাম, যার নাম ছিল তেহরি।"

– তার মানে? কোথায় গেল সেটা? আঁতকে উঠে দুজনেই জানতে চায়।

– না না!! গ্রামের লোকজনের কিছু হয়নি, তাদের অন্যখানে সরিয়ে নেয়া হয়েছিলো, কিন্তু বাঁধ তৈরির জন্য যে জলাধার তৈরি হল, গোটা তেহরি গ্রামটা তলিয়ে গেল তার তলায়। সেখানকার বাসিন্দারা কয়েকদিনের মধ্যেই হয়ে গেলো উদ্‌বাস্তু। উঠে আসতে হল পূর্বপুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে নতুন গড়ে তোলা গ্রামে। যার নাম হল নিউ তেহরি।

– ইসস, কি কষ্টের কাহিনী শোনালে গো। মনটা খারাপ হয়ে গেল।

– সভ্যতার বিস্তারের জন্য এরকম স্যাক্রিফাইস তো অনেকেই করেছে রে। ১৯৭৮ এ কাজ শুরু হয়ে বাঁধের ওপেনিং হয় ২০০৬ সালে। এতে তেহরি জেলার প্রচুর উন্নতিও হয়েছে।

– চলিয়ে জী।

ড্রাইভার রতনলালের ডাকে হুঁশ এলো আমাদের।

– চল চল, রাস্তা আভি বাকি হ্যায়।

রতনলালের সুইফট্ ডিজায়ার এগিয়ে চলল। গঙ্গোত্রীর রাস্তা এখন বেশির ভাগ জায়গাতেই ভালো। দুপাশের দৃশ্যও খুব সুন্দর। নানা ছোটো বড়ো গ্রাম পেরিয়ে এরপর যে বড়ো শহর আমরা পেলাম, তা হল চাম্বা। এই চাম্বা কিন্তু হিমাচলের চাম্বা নয়, এটি উত্তরাখন্ডের চাম্বা, নিউ তেহরি জেলার বড়ো শহর। বেশ জমজমাট শহর। মুসৌরি থেকে ধনৌলটি হয়ে আর একটি রাস্তা এসে চাম্বায় মিলেছে। আমরা অবশ্য এসেছি হৃষিকেশের রাস্তায়। যাওয়ার পথে এখানে আমরা থামিনি। রাস্তা গিয়েছে বারেথি, ধারাসু হয়ে। ধারাসু থেকে একটু এগিয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম দুটো রাস্তার জংশনে। রতনলালের কাছে জানতে পারলাম এই জংশনটিকে বলে ধারাসু বেন্ড। এখান থেকে ডানদিকে যে রাস্তাটি গেছে সেটি বারকোট হয়ে চলে গেছে যমুনোত্রীর দিকে। আর আমাদের রাস্তা গিয়েছে সোজা ডুন্ডা হয়ে উত্তরকাশী। ডুন্ডা এখান থেকে মাত্র দশ কিলোমিটার দূরে। ধারাসু বেন্ড এ ডানদিকের রাস্তাটির দিকে তাকিয়ে পুরনো কথা মনে পড়ে গেলো। প্রথম যেবার ডি.কে'র সাথে গঙ্গোত্রী আসি সেবার প্রথম আমরা যমুনোত্রী যাই আর সেখান থেকে বারকোটের এই রাস্তা ধরেই মনে হয় গঙ্গোত্রী গিয়েছিলাম। আমরা সেবার বাসে ছিলাম বলে এইসব রাস্তা সম্পর্কে জানার সুযোগ হয়নি।

দেখতে দেখতে ডুন্ডা ছাড়িয়ে গাড়ি এগিয়ে গেল। আর মাত্র ১৭ কিমি গেলেই আমাদের আজকের গন্তব্য উত্তরকাশী।

উত্তরকাশী পৌঁছাতে পৌঁছাতে দুপুর গড়িয়ে গিয়েছিল। অত অবেলায় কেউই আর ভাতের ঝামেলায় যেতে চাইলামনা। গেস্ট হাউসের রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে আমরা আবার বেরিয়ে পড়লাম। উত্তরকাশী জমজমাট শহর। সবকিছুই পাওয়া যায়। দেখেশুনে একটা সাউথ-ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়লাম আর একটা করে মশালা দোসা আর কফি দিয়েই লাঞ্চ সারা হলো।

– চল এবার উত্তরকাশী জায়গাটা একটু ঘুরে দেখে নি। কাল সকালেই তো আবার বেরোনো।

"এখানে কি দেখার আছে?"

রত্নার কথার উত্তরে বললাম, "নাম শুনেই তো বুঝতে পারছিস, এই জায়গাকে হিমালয়ের বারাণসী'র সমান মনে করা হয়। আর ভাগীরথী এখানে উত্তর বাহিনী হওয়ায় এই জায়গাকে বারাণসী'র মতোই পবিত্র ভূমি বলে। আর তাই সমতলের বারাণসী'র মতোই এখানেও প্রধান দ্রষ্টব্য হল বিশ্বনাথের মন্দির।"

উত্তরকাশীতে বিশ্বনাথ মন্দির

কথায় কথায় পৌঁছে গেলাম বিশ্বনাথ মন্দিরের কাছে। ছোট মন্দির। বেনারসের মতো জাঁকজমকপূর্ণ নয়, কিন্তু হিমালয়ের পটভূমিতে এই মন্দিরে এসে আমাদের মন ভরে গেল। পাশেই শক্তি মন্দির। সেসব দেখে আমরা এগিয়ে গেলাম ভাগীরথীর দিকে।

ভাগীরথীর তীরে উত্তরকাশী শহর

মন্দির থেকে কিছুটা মানে এই ২০০ মিটার এর মত এগিয়ে আমরা ভাগীরথীর পাড়ে চলে এলাম। নদীর দু'পারে গড়ে উঠেছে উত্তরকাশী শহর। একটা ব্রিজ দিয়ে নদীর দু'পার যুক্ত। স্থানীয় লোকজনের অনবরত যাতায়াত চলছে। আমরাও ব্রিজের মাঝখানে এসে দাঁড়ালাম। এখান থেকে নদী আর দু'পাশের শহরকে দেখতে ভারী সুন্দর লাগছে। সন্ধ্যা নেমে আসছে। শহরের আলোগুলো সব জ্বলে ওঠায় চারদিক ঝলমলে। মুগ্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমরা ফেরার পথ ধরলাম।

চায়ের কাপ আর সাথে আসার পথে কিনে আনা পকোড়া দিয়ে জোর আড্ডা বসেছিলো। রত্না আর বাসবীর হিমালয়ের এত দূরে আসা এই প্রথম। স্বভাবতই ওদের মনে নানান প্রশ্ন।

– স্বাগতাদি, এতোগুলো পাহাড় টপকে উত্তরকাশী এলাম, কিন্তু এই জায়গাটা তো বেশ সমতলই লাগছে। আমরা কি আবার অনেকটা নীচে নেমে এসেছি ?

– কিছুটা নেমে এসেছি, সেটা ঠিক। তাও উত্তরকাশীর উচ্চতা প্রায় চার হাজার ফুটের কাছে। আসলে ভাগীরথী এখানে বেশ চওড়া অববাহিকা পেয়েছে আর তার দু'পাশেই গড়ে উঠেছে উত্তরকাশী শহর। তাই রাস্তায় চড়াই-উতরাই টা কম। এই জায়গাটা কেমন লাগলো বল ?

"দারুণ দারুণ .... সমস্বরে বলে উঠলো দুজনে।

– গঙ্গোত্রী গেলে দেখবি মুগ্ধ হয়ে যাবি। আসতে মন চাইবে না।

"গঙ্গোত্রীর কথা রাতে বলবে বলেছিলে যে ? বলবেনা ?"

– ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখ কটা বাজে ? এইসব পাহাড়ি শহরে রাত হয় তাড়াতাড়ি। এরপরে আর খাবার পাবোনা।

রায়থলে তো আমরা দুদিন থাকবো, সেখানে গঙ্গোত্রীর গল্প হবে।

সকালে ঘুম ভাঙলো রতনলালের ফোনে। ও জানতে চাইছিল, আমরা কখন বেরোবো। আজ আমরা যাবো রায়থল। রায়থল এখান থেকে বেশি দূর নয়, তাই দশটা নাগাদ বেরোবো জানিয়ে রত্না আর বাসবীকেও ডেকে তুললাম।

– চল, চা খেয়ে আসি। তারপর বাসবীর দিকে তাকিয়ে বলি, কিরে, ঘুম হয়েছিলো তো ?

"দারুণ ঘুমিয়েছি। রাতে বেশ ঠান্ডাও পড়েছিলো।"

সময়টা অক্টোবরের শেষ দিকে। পাহাড়ে শীতের আগমনী শুরু হয়ে গেছে। মনে পড়ে গেল আজ সপ্তমী পুজো। এখানে অবশ্য পুজো বলে মনেই হচ্ছেনা।

ঠিক সকাল দশটায় আমরা রওনা হলাম উত্তরকাশী থেকে।

উত্তরকাশী ছাড়ানোর পর থেকেই পাহাড়ের পটভূমিরও পরিবর্তন হলো। এখান থেকে পথের ডানদিকে ভাগীরথীও চললো আমাদের সাথে সাথে আর বাঁ দিকের পাহাড়েও বেড়ে গেলো বিশাল বিশাল পাইন গাছের মেলা। গভীর গিরিখাতের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া স্বচ্ছ নীল জলের ভাগীরথী এই যাত্রাপথ কে একটা অন্য মাত্রা দিয়েছে। উত্তরকাশী থেকে দু কিমি গিয়েই এসে গেলো গঙোরি। গঙোরি থেকেই গিয়েছে ডোডিতাল ট্রেকের পথ। আমাদের গাড়ি চললো এগিয়ে। পথে পড়লো মানেরি ড্যাম। এখানে একটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। বিপুল পরিমাণ জলরাশি বেড়িয়ে এসে ভাগীরথীর বুকে পড়েছে। এ জায়গাটির দৃশ্য এতো সুন্দর যে না দাঁড়িয়ে পারা যায়না।

পৌঁছে গেলাম ভাটোয়ারি। এখান থেকে গঙ্গোত্রীর রাস্তা চলে গেল সোজা গঙ্গোত্রী হাইওয়ে ধরে আর আমাদের গাড়ি বাঁক নিলো ডানদিকের রাস্তায় রায়থলের দিকে।

রায়থল নামের সাথে এখনো খুব বেশি লোকের পরিচয় ঘটেনি। বেশির ভাগ লোকই উত্তরকাশী হয়ে গঙ্গোত্রীর দিকে চলে যায়। আমাদের এই জায়গাটা সাজেস্ট করে শৈবাল, যে আমাদের এবারকার সব জায়গাগুলোতে ট্যুরিস্ট লজ বুক করে দেয়।

"আপনারা যখন বিশ্রাম নিয়ে নিয়েই ঘুরতে চান, তখন রায়থল গ্রামটা আইটেনেনারি যোগ করে নিন, দেখবেন ভালো লাগবে।"

গঙ্গোত্রী যাবার পথে

রায়থলের ট্যুরিস্ট বাংলোর সামনে নেমে প্রথমেই শৈবালের কথাটাই মনে এলো। বাসবীও বলে উঠলো, "ভাগ্যিস শৈবালের পরামর্শ শুনেছিলাম। দেখো চারপাশে তাকিয়ে কি অপূর্ব দৃশ্য।"

সত্যিই তাই। লজ এর লনে দাঁড়ালে দেখা যায় সামনে স্তরে স্তরে পাহাড়ের সারি চলে গিয়েছে আর সেসব পেরিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে যে পাহাড়টি তার মাথায় বরফের মুকুট।

৫৯০০ মানে প্রায় ৬০০০ ফুট উচ্চতায় হিমালয়ের অন্দরে ঘুমিয়ে থাকা শান্ত, নিরিবিলি একটি গ্রাম হলো এই রায়থল। লন থেকে কিছুটা দূরে গ্রামের কিছু ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে। চাবি নিয়ে বাবুল (নামটা জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছিলাম) ঘর খুলে দিল।

– দুপুরে খাবার কি পাওয়া যাবে, বাবুল ?

"লজে তো আভি কোই ট্যুরিস্ট নেহি হ্যাঁয় দিদি। স্রিফ আপলোগ আয়ে হ্যাঁয়, ইসিলিয়ে জ্যায়দা তো কুছ নাহি মিলেগা, স্রিফ ডাল, চাউল আর পাপড় মিলেগা।"

– বলে কি ছেলেটা!!! এতো বড়ো একটা দোতলা বাড়িতে স্রেফ আমরা তিনটে মেয়ে আর এই স্টাফেরা!!!

– স্টাফ কিতনা হ্যাঁয় ইধার ?

যা বললো তাতে বুঝলাম যে এখানে ট্যুরিস্ট খুব কমই আসে। তাই স্টাফ বলতে ম্যানেজার সাব, একজন পাহাড়াদার আর বাবুল নিজে একাধারে কুক আর বেয়ারার কাজ সামলায়।

কেবল দয়ারা বুগিয়ালের ট্রেকাররাই এখানে আসে কারণ এটাই দয়ারা বুগিয়াল যাত্রার বেস ক্যাম্প।

– ও স্বাগতাদি বাবুলকে জিজ্ঞেস করোনা ডিম পাওয়া যাবে কিনা? আসলে জানোই তো হিন্দিটা আমার ঠিক আসেনা।

ডিমের কথা জিজ্ঞেস করাতে বাবুল আমাদের আশ্বস্ত করলো এই বলে যে এখন হবেনা কারণ স্টকে নেই তবে একটু দুরেই লালাজির দোকান থেকে আমরা ডিম কিনে এনে দিলে ও রাতেরবেলা রান্না করে দেবে।

বাবুলের কথা শুনে রত্না তো হাঁ হয়ে গেছে।

"সেকি গো স্বাগতাদি, এতবড়ো একটা ট্যুরিস্ট লজ খুলে বসে আছে অথচ ডিমটাও স্টকে রাখেনা।"

– রত্না এই হল হিমালয়। এখানকার লোকদের প্রয়োজন এত কম যে সেটা আমরা শহুরে মানুষেরা ভাবতেই পারিনা।

গরম ভাতে ঘি আর কাঁচা লঙ্কা আর ডাল, পাঁপড় ভাজা দিয়ে জম্পেশ করে লাঞ্চ শেষ করলাম।

– এটাই হিমালয়ের মাহাত্ম্য, বুঝলি। এখানে সবই ভালো লাগে, যদি হিমালয় কে ভালবাসতে পারিস।

রায়থলে কালকের দিনটি প্রকৃতির বুকে নিটোল বিশ্রামের মধ্যে কাটাবো। তাই দুপুরে পরিপাটি করে ঘুম দিয়ে উঠে বেরোলাম বাবুল বর্ণিত লালার দোকানের খোঁজে। সত্যিই বেশি দূরে নয়, কিছুটা গিয়েই জিজ্ঞেস করাতে একজন লালার দোকান দেখিয়ে দিলো। গিয়ে দেখি, কয়েকজন স্থানীয় লোকজন দোকানে বসে গল্প করছে, কেউ আবার চা খাচ্ছে। আমরাও চা আর ডিমের অমলেট নিয়ে বসলাম। লালার দোকানে দেখলাম, আলপিন টু এলিফ্যান্ট সবকিছু পাওয়া যায়। এরকম আমি আরও অন্য জায়গাতেও দেখেছি। গ্রামের মধ্যে এরকম একটা দোকান থাকে যেখান থেকে গ্রামের লোকজনের নিত্যপ্রয়োজনীয় সবকিছুই মেলে। তাছাড়া এইসব দোকানগুলোতে বসেই গ্রামের লোকেরা সবার

খবরাখবরও রাখে। আসার সময় আমরা একটু বেশি করেই ডিম, আলু আর পেঁয়াজ কিনে আনলাম যাতে তিনজন স্টাফেরও হয়ে যায়।

রায়থল গ্রামের বাড়ী

পরদিন সকালে ফ্রেশ হয়ে রায়থল গ্রামটা পায়ে হেঁটে এক্সপ্লোর করতে বেরোলাম। বেরিয়েই শুনতে পেলাম দূরে ঢোল, শিঙা এসবের আওয়াজ। মনে পরে গেলো আজ মহাষ্টমী। কালকের লালার দোকানে গিয়ে এক কাপ করে চা নিয়ে বসলাম। বাজনা বাজছে কোথায় জিজ্ঞেস করাতে লালা বললেন, "ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে মাথায় লাল পতাকা উড়ছে, ওটা হল মাতাদির মন্দির। ওইখানে নবরাত্রির পূজা হচ্ছে।" আমরাও তিনজনে মন্দিরের দিকে রওনা হলাম। গ্রামের বেশ কিছু লোকজনকেই দেখলাম সেজেগুজে ওইদিকেই চলেছে। আমরাও ওদের পিছনে পিছনে চললাম। ফলে রাস্তা চিনতে কোনোই অসুবিধে হলোনা। মন্দিরে গিয়ে দেখি পুজো চলছে।

সমস্ত উত্তর ভারতেই নবরাত্রির চল আছে। এও আসলে মা দুর্গারই পূজা, তবে মা এখানে আমাদের মতো সিংহবাহিনী নন। মা এখানে বাঘের উপর বসা। বেশ কিছুক্ষণ ওখানে বসে, হোমের তিলক পরে, প্রসাদ নিয়ে আমরা ফেরার পথ ধরলাম।

আজ বিকেলে কমপ্লিট বিশ্রাম। কাল সকালেই রওনা হবো গঙ্গোত্রীর দিকে। লনে এসে বসলাম। বাবুল বেশ বড়ো বড়ো গ্লাসে করে চা আর আলু পেঁয়াজের পকোড়া দিয়ে গেল। চায়ে চুমুক দিয়ে রত্না বললো, "এবার গঙ্গোত্রীর সম্বন্ধে যা জানো বল।"

বাসবীও দেখলাম উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে।

পকোড়ায় কামড় দিয়ে আর চায়ে গলাটা একটু ভিজিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করি।

– এটা তো নিশ্চয়ই জানিস যে ভারতের যত তীর্থক্ষেত্র আছে তাদের মধ্যে চার ধাম তীর্থস্থান হিসাবে অতি পবিত্র; সেগুলো হলো কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, গঙ্গোত্রী আর যমুনোত্রী। এদের মধ্যে প্রথম দুটি দেবাদিদেব মহাদেব আর ভগবান বিষ্ণু'র মন্দির আর পরের দুটি উত্তর ভারতের প্রাণ দুই বিখ্যাত নদী গঙ্গা আর যমুনাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। প্রকৃতিকেই এখানে দেবী হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। আমরা এবারে যাচ্ছি সেই গঙ্গোত্রীতে। গঙ্গাকেই এখানে পূজা করা হচ্ছে।

হর্ণ বাজাতে বাজাতে একটা বোলেরো এসে দাঁড়ালো ট্যুরিস্ট লজের সামনে আর সেটা থেকে নেমে এলো জনা আটেক ইয়াং ছেলে। ওদের সঙ্গে প্রচুর মালপত্র। দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে ট্রেকিং করতে যাচ্ছে। এখান থেকে যেহেতু দয়ারা বুগিয়াল ট্রেকিংটাই হয়, তাই বোঝাই যাচ্ছে যে ওরা সেখানেই যাচ্ছে। বাবুল খুব ব্যস্ত আজকে। ছেলেদের দলও

লাগেজ রেখে এসে চা নিয়ে লনে বসলে আমরাও এগিয়ে গেলাম আলাপ করতে। ওরাও বেশ উৎসুক ছিলো, কারণ এরকম মধ্যবয়স্কা তিনজন মহিলাকে কোনো পুরুষ সঙ্গী ছাড়া রায়থলের মতো জায়গায় দেখবে বলে হয়তো ভাবেনি।

ঠিকই অনুমান করেছিলাম। ওরা যাচ্ছে দয়ারা বুগিয়ালে। দয়ারা বুগিয়াল এখান থেকে চার / পাঁচ দিনের ট্রেক। ওদের মুখেই শুনলাম, এই ট্রেক যে দুর্গম তা নয়, তবে সৌন্দর্যের দিক দিয়ে এর খ্যাতি আছে।

গল্পে গল্পে রাত প্রায় নটা বাজে। হিমালয়ের এই সব জায়গায় নটা মানে গভীর রাত। এর মাঝে আর একবার চা দিতে এসে বাবুল একটু তাড়াও দিয়ে গিয়েছিলো। আমরাও সবাই গল্পের আসর ভঙ্গ করে ডাইনিং হলের দিকে পা বাড়ালাম।

সক্কাল সক্কাল ঘুম ভেঙে গেলো। কাল রাতে বাবুল খিচুড়ি টা দারুণ রান্না করেছিলো। গরম গরম খিচুড়ি, তাতে খাঁটি ভয়সা ঘি, পাঁপড় আর ডিমের অমলেট .... আহ, আর কি চাই।

জম্পেশ ডিনার, ঠান্ডা আবহাওয়া .... ঘুমটাও হয়েছিল গভীর। উঠতে না উঠতেই বাবুল চায়ের কাপ হাতে হাজির। হিমালয়ের পথে এই সহজ সরল পাহাড়ি ছেলেগুলোকে কাছ থেকে দেখাটা একটা পরম প্রাপ্তি বলে আমার মনে হয়। তাড়াতাড়ি করে রেডি হয়ে ট্রেকার দলের সাফল্য কামনা করে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। বাবুল গাড়ির কাছে অবধি এলো আমাদের সাথে সাথে আর ওর সাথে এলো লজের কুকুরটাও। ও-ও যেন আমাদের বিদায় দিলো। রায়থলে এসে এই দুদিনের পরিচিত বাবুলকে আমরা কোনোদিনই ভুলতে পারবোনা।

ভাটোয়ারি থেকে আমরা আবার মূল যাত্রাপথে অর্থাৎ গঙ্গোত্রী হাইওয়ে ধরে যাবো। ভাটোয়ারি থেকে গঙ্গোত্রী মোট একাত্তর কিলোমিটার। এই উচ্চতায়, পাহাড়ি পথে একাত্তর কিমি কিন্তু কম রাস্তা নয়। যাই হোক কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ভাটোয়ারির মূল যাত্রাপথে পৌঁছে গেলাম। ভাটোয়ারি'র পর উল্লেখযোগ্য জায়গা হলো ১২ কিমি দূরে গাংনানী আর গাংনানী থেকে ৩১ কিমি দূরে হরশিল।

ভাটোয়ারির পর থেকেই পাহাড়ের পটভূমির পরিবর্তন ঘটতে থাকে মুহুর্মুহু। রাস্তার ডানদিকে অনেক নীচে গিরিখাতের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে খরস্রোতা ভাগীরথী। নদী পাহাড় ভেদ করে তার নিজের পথ তৈরি করে এগিয়ে চলেছে। নদীর তীব্র গর্জনে কান পাতা দায়। আর রাস্তার বাঁ পাশে বিশাল বিশাল পাইন গাছে ঢাকা পাহাড় উঠে গেছে। কোথাও আবার পাহাড়ের গা বেয়ে ঝর্ণা নেমে এসে নীচে ভাগীরথীর বুকে মিশে গেছে। এতো সুন্দর যাত্রাপথ খুব কম জায়গায়ই দেখা যায়। মুগ্ধ হয়ে রাস্তার দৃশ্য দেখতে দেখতে পেরিয়ে এলাম ৪৩ কিমি রাস্তা। গাড়ি এলো হরসিলে।

ভাগীরথী নদী

৯০০৫ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত হরসিল গ্রামটি যেন মনে হয় তুলিতে আঁকা কোনো ছবি। ভাগীরথী এখানে বেশ চওড়া আর তার পাড়েই পাহাড়ের ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছে গ্রামটি। চারদিকে ঘন সবুজ দেওদার জঙ্গল আর আপেল বাগানে ঘেরা এই অপরূপা গ্রামটি যেন ভাগীরথীর কোলে ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু এখন আমাদের এখানে দেরী করা যাবেনা। আরো ৩০ কিমি গেলে আমরা গঙ্গোত্রী

পৌঁছোবো। তাই গরম গরম চায়ে চুমুক দিয়ে শরীর একটু গরম করে আবার গাড়িতে উঠে বসলাম। কিন্তু একটু যেতে না যেতেই তিনজনই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলাম, "রুকিয়ে রতনলালজি রুকিয়ে"।

আসলে আমাদের চোখ পড়েছে তখন রাস্তার পাশে বসে থাকা ছেলেদের উপর। সামনে টুকটুকে লাল লাল পাকা আপেল নিয়ে ওরা বসে আছে বিক্রির আশায়। হরসিল থেকে ধারালি পর্যন্ত এই অঞ্চলটি আপেলের জন্য বিখ্যাত। আর দাম? অবিশ্বাস্য রকমের সস্তা। মাত্র ১২ টাকা কেজি। কেজি তিনেক আপেল কিনে আবার রওনা হলাম।

গঙ্গোত্রীর পথে ভাগীরথী নদী

ধারালি পেরিয়ে এগিয়ে চললাম ১৪ কিমি দূরের লঙ্কা চটির দিকে। দু'পাশে আকাশ ছোঁয়া পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে পথ গিয়েছে। গাড়ির মধ্যে কেউই আর কোনো কথা বলছিনা। দু চোখ ভরে এই অপার্থিব সৌন্দর্য কে ধরে রাখার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে আছি। পৌঁছে গেলাম আমরা ভৈরব ঘাটি বা ভৈরোঘাটি। আজ থেকে ত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ বছর আগেও ভৈরোঘাটি গাড়িতে করে পার হওয়া যেতনা। এই ঘাটির উপর দিয়ে একটা পায়ে চলা পুল ছিল। গঙ্গোত্রী যাত্রীরা ঘাটির এপারে নেমে পায়ে হেটে পুল পার হতো। ওপারে আবার গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতো আর যাত্রীরা সেই গাড়িতে চেপে গঙ্গোত্রী পৌঁছোতো। কিন্তু আমাদের কোনো ঝামেলাই করতে হলোনা আমরা গাড়িতে বসে আরামেই ভৈরোঘাটির সেই কুখ্যাত চড়াই পেরিয়ে এলাম।

গঙ্গোত্রী আর দূরে নেই। মাত্র ৯ কিমি গেলেই পৌঁছে যাবো গঙ্গোত্রী ধাম, যার জন্য কবে থেকে তিনজনে মিলে পরিকল্পনা করে এসেছি। দূরের বরফে ঢাকা শৃঙ্গটি এখন অনেক কাছে এগিয়ে এসেছে। গাড়ি একটা করে মোড় ঘুরছে আর নতুন নতুন দৃশ্য চোখে ধরা পড়ছে। আধ ঘন্টার মধ্যেই রতনলালজি গাড়ি পার্ক করলো গঙ্গোত্রীর কার পার্কিং-এ।

গঙ্গোত্রীর কার পার্কিং-এ পৌঁছে আমি আমার চেনা সেই শান্ত সমাহিত গঙ্গোত্রীর সাথে এখনকার গঙ্গোত্রীকে কোনোমতেই মেলাতে পারছিলামনা। কোথায় সেই চারদিকে পাইন আর দেবদারু গাছে ছাওয়া ছোট্টো কার পার্কিং, যেখানে গাড়ি থেকে নামতেই কানে এসেছিলো কিছুটা নীচ দিয়ে বয়ে যাওয়া ভাগীরথীর তুমুল কলরোল; এখন সেখানে ঝাঁ চকচকে কার পার্কিং। চারিদিকে নানান হোটেল বা যাত্রীনিবাসের মেলা। আর দোকানের তো সীমা সংখ্যা নেই। তবে এটা ঠিক, যে আমার মনে গঙ্গোত্রীর পুরোনো চেহারাটা দাগ কেটে বসে আছে বলেই হয়তো আমার এমনটা মনে হচ্ছে। প্রথমবার যারা আসছে, তাদের কাছে গঙ্গোত্রীর এই রূপটিও ছবির মতোই সুন্দর।

পার্কিং-প্লেস থেকে একটা রাস্তা সোজা চলে গিয়েছে মন্দিরের দিকে। পোর্টার এর কাছে মালপত্র দিয়ে আমরাও রওনা দিলাম আমাদের আবাস জি. এম. ভি. এন এর ট্যুরিস্ট লজের দিকে। গঙ্গোত্রীতে আমাদের থাকার মেয়াদ দু'দিন। এই দু'দিন ড্রাইভার রতনলাল এদিকেই কোথাও থাকবে।

"কোই ভি জরুরত পড়ে তো মুঝে ফোন কর দেনা, ম্যাডামজি। ম্যায় ইহাপেই ঠ্যারনা হ্যায়। আপলোগ আনন্দ সে ঘুমকে আইয়ে" .... এই বলে হাসিমুখে আমাদের বিদায় জানাল।

রাস্তা সোজা চলে গিয়েছে মন্দিরের দিকে। রাস্তার দু'ধারে শুদ্ধ ভোজনালয়, ক্যাফেটেরিয়া আর বিভিন্ন মানের যাত্রীনিবাস।

মূল রাস্তায় কিছুটা গিয়ে পোর্টার আমাদের ডান দিকের একটা রাস্তায় নিয়ে চলল। এটা নাকি ট্যুরিস্ট লজে যাওয়ার শর্টকাট রাস্তা। একটু পরেই আমরা ভাগীরথীর পাশে চলা রাস্তায় চলে এলাম। ডানদিকে বিশাল বিশাল পাথরে ধাক্কা খেতে খেতে সগর্জনে বয়ে চলেছে ভাগীরথী। নীল জলে সাদা ফেনা ছড়িয়ে নদীর এই চলার কোনো বিরাম নেই। অনাদি অনন্তকাল ধরে বয়ে চলেছে। এই নদীই নিচে গিয়ে গঙ্গা নাম নিয়ে উত্তর ভারতের প্রাণদায়িনী হয়ে বয়ে গেছে সাগরের দিকে।

খানিকটা গিয়েই নদীর ওপর একটা ব্রিজ। আমরা তিনজনেই ব্রিজের ওপর সোজা উত্তর দিকে মুখ করে কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম। সামনে সোজা স্তরে স্তরে পাহাড়ের শ্রেণি চলে গিয়েছে। তাদের পেছনে দেখা যাচ্ছে একটা স্নো পিক। চোখের সামনে কলনাদিনী ভাগীরথী। ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে মনে হলো, না গঙ্গোত্রী আছে তার পুরোনো মহিমাতেই। আসার পথে যে জাঁকজমক দেখে এলাম, সেটা তার বহিরঙ্গে, অন্তরে সে একইরকম আছে। ব্রিজের ওপারেও অনেক বড়ো বড়ো লজ রয়েছে। আমাদের জি এম ভি এন এর বাংলোটিও ব্রিজ পেরিয়ে ডান দিকের রাস্তায় খানিকটা গেলে একেবারে নদীর ধারে রাস্তার পাশেই। গঙ্গোত্রীর উচ্চতা ১০২০০ ফুট। এতখানি উচ্চতায় এই রাস্তাটুকু আসতেই আমাদের বেদম অবস্থা। আমাদের সবার কাছেই অবশ্য কর্পূরের পুটুলি ছিলো। উচ্চতাজনিত কারণে যখন শ্বাসকষ্ট হয় তখন কর্পূর ম্যাজিকের মতো কাজ দেয়।

হাঁফাতে হাঁফাতে ট্যুরিস্ট লজে পৌঁছে কিন্তু মনটা ভরে গেলো। এই লজে আমিও প্রথমবার। ১৯৮৯ সালে প্রথম যেবার গঙ্গোত্রী আসি তখন এখানে কোনো হোটেল বা লজ ছিলোনা। জি এম ভি এন এর ছোট্ট একটা ট্যুরিস্ট লজ তখন সবে তৈরি হয়েছিলো আর বাদবাকি সবই ছিলো সাধুদের আশ্রম। পরের দুবার অবশ্য ছিলাম ব্রিজ পেরিয়ে একটু ওপরে বিরলা মঙ্গল নিকেতনে।

রাস্তা থেকে গেট খুলে ঢুকেই বেশ বড়ো লন। চারপাশে ফুলের গাছ। লনে অনেক চেয়ার দেয়া। বোর্ডাররা বসে কেউ রোদ পোহাচ্ছেন আবার ট্রেকাররা, যারা গোমুখ ট্রেক করে ফিরেছেন তারাও তাদের রুকস্যাক আনপ্যাক করে রোদে সব শুকিয়ে নিচ্ছেন। আবার যাঁরা গোমুখ যাবেন ভেবে এসেছেন, তাঁরা গোমুখ ফেরত যাত্রীদের কাছে রাস্তার হালহকিকত জেনে নিচ্ছেন। সব মিলিয়ে একটা জমাটি পরিবেশ। রাস্তার পরেই নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে খরস্রোতা ভাগীরথী। সময়টা অক্টোবরের শেষদিক। কনকনে ঠান্ডা হাওয়া বইছে। তবে ঝলমলে রোদ থাকায় কষ্ট হচ্ছেনা।

অনেকটা বেলা হয়ে গেছে। তাই রুমে ঢোকার আগেই আমরা মালপত্র লনে রেখেই লাঞ্চ করতে চলে গেলাম। এসব জায়গায় জানি, মালপত্র খোলা পড়ে থাকলেও কিছু হবেনা।

বিকেলে আলো পড়ে আসার আগেই তিন বন্ধুতে আমরা বেড়িয়ে পড়লাম মন্দিরের দিকে। গঙ্গোত্রী ধামে গঙ্গা মাতার মন্দির আর ভাগীরথী কে ঘিরেই এখানকার জীবন আবর্তিত হচ্ছে। এত এত লোকের জীবিকা নির্বাহও হচ্ছে এদের ঘিরেই। বাইরে থেকে যারা এখানে আসে তাদের একটা বড়ো অংশই হলো তীর্থযাত্রী আর একদল মানুষ আসেন হিমালয়কে ভালোবেসে। পায়ে হেঁটে হিমালয়ের দুর্গম পথের যাত্রী এরা। এখান থেকে গোমুখ, তপোবন, কালিন্দী খাল ইত্যাদি জায়গায় ট্রেকিং হয়। তাই এখানে নানান ধরনের, নানান বয়সের লোকের সাথে দেখা হয় অহরহ। অলস ভাবে এইসব ভাবতে ভাবতে নদীর এপার দিয়ে আমরা চলেছি ব্রিজের দিকে। নদীর ওপারে মন্দির, তাই দোকান পাট, হোটেল লজের ভিড়টাও ওদিকেই বেশি। এদিকের রাস্তায় লোকজন অনেক কম আর দোকানপাট নেই বললেই চলে। গিয়ে দাঁড়ালাম ব্রিজের ওপরে। চোখের সামনেই সূরজ কুন্ড। এখানকার পাথরের আকৃতিটা একটু অদ্ভুত ধরনের। রত্না

আর বাসবীকে জায়গাটা দেখালাম। বললাম, "এই জায়গায় পাথরের আকৃতিটা দ্যাখ। এই জায়গাটিকে বলে সূর্য কুন্ড।"

ওরা দুজনেই বলে ওঠে, "দ্যাখো স্বাগতাদি, এই পাথরের দিকে একভাবে তাকিয়ে থাকলে কেমন গণেশের মুখের সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা ? কি আশ্চর্য বলো ?"

"একদমই তাই। এটাই মহিমা। জানি যে অনাদি অনন্তকাল ধরে স্রোতের ঘর্ষণে এইরকম দেখতে হয়েছে। কিন্তু দ্যাখ, অন্য কোথাও তো এইরকম সেপ হয়নি।"

সূর্য কুন্ড

"সূরজ কুন্ড কে নিয়ে কোনো কাহিনী চালু নেই ? বলনা শুনি। এই অসাধারণ পরিবেশে দাঁড়িয়ে সবই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়।"... বাসবীর কথার উত্তরে বললাম, "তা আর নেই ? স্থানীয় লোককথায় প্রচলিত আছে যে দেবী পার্বতী এই পাথরে বসে সূর্য দেবের তপস্যা করেছিলেন। শুনেছি ভোরের প্রথম সূর্যের আলো এর ওপর পরে আর এখানে অপূর্ব এক রামধনুর সৃষ্টি হয়।"

কিছুক্ষণ বিভোর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম ভাগীরথীর জলধারার দিকে তাকিয়ে। এখানকার এই এক বিশেষত্ব। ভাগীরথীর তীরে বসে এই অবিরাম স্রোতের দিকে তাকিয়েই সময় কাটানো যায়। এখান থেকে নদীর অন্য পারেই গঙ্গা মাতার মন্দির দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের যেতে হবে ব্রিজ পেরিয়ে একটু ঘুরে।

মূল রাস্তায় উঠলেই লাইন দিয়ে খাবারের, চায়ের আর পুজোর সামগ্রীর দোকান। আমরাও ঢুকে পড়লাম একটি চা কফির দোকানে। এইরকম উচ্চতায় শরীরের প্রয়োজনেই চা বা কফি বারেবারে দরকার হয়। এতে শরীরও একটু গরম হয়, আর জলের প্রয়োজনীয়তাও মেটে।

পুজো আমরা কাল সকালেই দেবো ঠিক করেছিলাম। এখন আমরা দেবীকে দর্শন করবো আর সন্ধ্যায় গঙ্গারতি দেখে লজে ফিরবো।

চা খেয়ে এগিয়ে চললাম। একটু গিয়েই মূল প্রবেশদ্বার পেরিয়ে মন্দির চত্বরে এসে দাঁড়ালাম।

বিশাল বাঁধানো চত্বরের একপাশে সাদা ধপধপে মার্বেল পাথরের মন্দির। বাহুল্য বর্জিত তবে এই পরিবেশে বড়োই আকর্ষণীয় লাগে। চত্বর থেকে তাকালে মন্দিরের উল্টো দিকেই সোজা চোখ টানে একটি চিরতুষারাবৃত শৃঙ্গ। চত্বরের বাঁ দিকে আরও অনেক দালান। এতে মন্দির কমিটির নানা অফিস ইত্যাদি রয়েছে।

মন্দিরে এখন বেশি দর্শনার্থী নেই। আসলে অক্টোবরের এই শেষ দিকে ঠান্ডার ভয়ে যাত্রীর ভিড় কম থাকে। আমার আবার তাই এই সময়টাই বেশি পছন্দের। শীত বেশি হলেও শান্তিতে মন্দির দর্শন বা পূজা দেয়া যায়। শুনেছি মে / জুন মাসে যাত্রী সিজনে এতো ভিড় হয় যে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়াতে হয়। আমরা মন্দিরে গেলাম। প্রাণভরে দেবীকে দেখে বেড়িয়ে নদীর ঘাটের দিকে এগোলাম।

নদীর ঘাট এখন বিশাল। মাঝে বেশ চওড়া খানিকটা বাঁধানো চত্বর আর তারপরে ধাপে ধাপে বাঁধানো সিঁড়ি নেমে গেছে নদী পর্যন্ত।

চত্বরের মাঝেই রয়েছে ভগীরথ শিলা। প্রথম দুবার এখানে শুধু শিলাই ছিলো আর ছিলো ছোট্ট একটি সাইনবোর্ড, যার থেকে জানা গিয়েছিল যে এই সেই শিলা, যার ওপর বসে ভগীরথ কঠোর তপস্যা করে মা গঙ্গাকে মর্ত্যে নিয়ে আসেন। গঙ্গার পুণ্য স্পর্শে সগর রাজার ষাট হাজার পুত্রের মুক্তিলাভ ঘটে। এখন সেখানে ছোটো একটি মন্দির তৈরি হয়েছে আর রীতিমতো পূজা অর্চনা চলছে। চত্বরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেশ কিছু লোকজন পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে জল দান করছেন। আমরা তিনজনে একটু নিরিবিলি দেখে ঘাটের ধাপে বসলাম একান্তে ভাগীরথীর এই উচ্ছল রূপ দেখবো বলে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে। আমরাও এগোলাম মন্দিরের দিকে। আস্তে আস্তে চত্বর ভরে উঠলো আর ঠিক অন্ধকার নেমে আসতেই শুরু হলো আরতি। তিনজন পুরোহিত প্রথমে দেবী গঙ্গাকে আরতি করলেন বিরাট বিরাট গাছ- প্রদীপ দিয়ে, আর তারপরে ভাগীরথীর দিকে মুখ করে ভাগীরথীকে আরতি করলেন। গঙ্গা কে আরতি অবশ্য হরিদ্বার বা হৃষিকেশ সবজায়গাতেই হয়, তবু হয়তোবা পরিবেশের জন্যই এই ১০২০০ ফুট উচ্চতায় হিমালয়ের অন্দরে অবস্থিত এই মন্দিরের আরতি যেন অন্যরকম মাত্রা পেল।

গঙ্গোত্রী মন্দীর

আরতি শেষে পরিতৃপ্ত মনে লজে ফিরে এলাম।

লজে ফেরার পথেই টের পেয়েছিলাম ঠান্ডা কাকে বলে। জামাকাপড় ভেদ করে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া যেন হাড় অবধি কাঁপিয়ে দিচ্ছে। রুমে ঢোকার আগেই ডাইনিং এ গিয়ে এক পট কফির অর্ডার দিয়ে রুমে এসে সোজা কম্বল মুড়ি দিয়ে বসলাম।

কফি আর পকোড়া এসে গেলে তাতে আয়েস করে একটা চুমুক দিতে না দিতেই রত্নার ফরমাস, "এবার বল"

– কি ?

"গঙ্গোত্রী'র মন্দির নিয়ে যা জান ?"

হেসে বলি, "তোদের প্রশ্নের ভয়েই আসার আগে কিছু পড়াশোনা করেই এসেছিলাম রে।"

নদী তো এখান দিয়ে অনাদি কাল ধরেই বয়ে চলেছে। চারধামের একধাম হিসেবে গঙ্গোত্রী কবে থেকে খ্যাত হয়েছে তাও সঠিক ভাবে জানা যায়নি। তবে এখানে প্রথম মন্দির তৈরি হয় অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে নেপালের এক জেনারেল অমর সিং থাপার হাতে ভাগীরথীর তীরে ওই ভগীরথ শিলার পাশে। ওই মন্দির নষ্ট হয়ে গেলে পরবর্তী কালে জয়পুরের মহারানা বর্তমানের এই মন্দিরটি তৈরি করেন। এটি পুরো মার্বেল পাথরের তৈরি। তবে দ্যাখ আমার মনে হয়, মন্দিরের থেকেও অনেক ইম্পর্ট্যান্ট এখানে প্রকৃতি। এই মন্দিরটিই যদি এখানে না হয়ে কলকাতার গঙ্গার ধারে হতো, তবে কি আমাদের এতো আকর্ষণ করতো? গল্পে গল্পে প্রায় ৮ টা বাজে।

এসব জায়গায় রাত হয় তাড়াতাড়ি, দিনের শুরুও হয় তাড়াতাড়ি। তাই গল্পের আসর ভাঙতেই হোলো লজের বেয়ারার ডাকাডাকি তে।

সকালে ঘুম ভাঙলো দরজায় বেলের আওয়াজে। বেড টি নিয়ে এসেছে। উঠতেই হলো ডবল লেপের আরাম ছেড়ে। কালকে আমরা গরম জামাকাপড় সবকিছু পরেই লেপের তলায় ঢুকেছিলাম। তাও কি ঠান্ডা!! এমনিতেই রাতে এখানে ঠান্ডা ২/৩ ডিগ্রি তে নেমে যায় এখনই, তার ওপর ট্যুরিস্ট লজটা আবার একেবারে নদীর ধারে। ঠান্ডা তো হবেই। চা খেয়ে গরম জলে এক এক করে চান সেরে আমরা বেড়িয়ে পড়লাম মন্দিরের দিকে।পুজোর ডালা কিনে ফাঁকায় ফাঁকায় পুজো দিয়ে বেরিয়ে এলাম। পূজারিজী খুব যত্ন করেই পুজো দেওয়ালেন। পুজো এখানে খুবই আড়ম্বরহীন। পুজোর পরে একটি দোকানে ঢুকে গরম গরম পুরি সবজি দিয়ে জলখাবারের পাট শেষ করে চলে এলাম ভাগীরথীর পাড়ে। তবে আমরা ব্রিজ পেরিয়ে নদীর এপাড়ে এসে বসলাম। এপাড়টা বেশ ফাঁকা। মাঝে মাঝে দু'চারজন লোকের যাতায়াত। আজ আমাদের কোনো তাড়া নেই, কোনো কাজও নেই। বসে বা পায়ে হেঁটে আজ শুধু গঙ্গোত্রীর

সৌন্দর্য দেখা আর ভাগীরথী কে দেখা। আজকের দিনটি আমরা ইচ্ছে করেই বিশ্রামের জন্য রেখেছিলাম। তাড়াহুড়ো করে এলাম, পুজো দিলাম আর চলে গেলাম করলে গঙ্গোত্রী তীর্থযাত্রা হয়তো হয়, কিন্তু গঙ্গোত্রীকে দেখা সম্পূর্ণ হয়না।

মাঝে একবার হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গিয়েছিলাম গোমুখের রাস্তাটা রত্নাদের দেখাতে। মন্দিরের পেছন থেকে একটা লম্বা সিড়ি অনেকটা উঁচুতে তুলে দিয়েছে। কিন্তু আর এগোনো গেলোনা কারণ এখন গোমুখ যেতে পারমিট নিতে হয় আর সিড়ির মুখেই পারমিট চেকিং এর অফিস খুলে তাবুতে বসে আছেন পুলিশের লোক।

গোমুখ মানে গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়ার এর স্নাউট, যেখান থেকে ভাগীরথী নদীর প্রবাহ হয়ে বেরিয়ে এসেছে, তার ক্ষয়ক্ষতি এড়াবার জন্যই এখন গোমুখ যাত্রায় অনেক কড়াকড়ি করা হয়েছে। আবার অলস ভাবে হাঁটতে হাঁটতে আমি ডান্ডীবাবার আশ্রমের খোঁজেও গেলাম, কিন্তু কোনোভাবেই জায়গাটা খুঁজে বের করতে পারলাম না। স্থানীয় বয়স্ক একজন কে জিজ্ঞেস করে জানলাম যে সেই আশ্রম আর নেই। সেখানে বড়ো হোটেল হয়ে গেছে। মনটা একটু খারাপ হয়ে গেলো। প্রথম যখন গঙ্গোত্রী এসেছিলাম তখন এখানে হোটেলের নামগন্ধও ছিলোনা। যাত্রীদের কাছে এই আশ্রমগুলোই ছিলো ভরসা। একদম কমবয়সে এসে আমরা উঠেছিলাম ওই ডান্ডীবাবার আশ্রমে।

গঙ্গোত্রী মন্দীর থেকে প্রাকৃতিক দৃশ্য

এখান থেকে ১.৫ কিমি গেলে পাওয়া যাবে পান্ডব গুহা। এটি একটি প্রাচীন প্রাকৃতিক গুহা। কথিত আছে, পান্ডবেরা কৈলাশ যাত্রার আগে এই গুহায় তপস্যা করেন। যদিও আমাদের সেখানে যাওয়া হয়নি। আমরা বিকেলে লজের লনে বসে তপোবন ফেরত একদল ট্রেকারের মুখে এই গল্প শুনেছিলাম।

গঙ্গোত্রী তে আজই আমাদের শেষ দিন। কাল সকালেই আমরা রওনা হয়ে যাব হরসিলের দিকে। সকালে উঠে শেষ বারের মতো মন্দিরে প্রণাম জানিয়ে আর ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে সুর্য কুন্ডের অপূর্ব প্রাকৃতিক ভাস্কর্য কে দেখে হাঁটা দিলাম কার পার্কিং এর দিকে। যেতে যেতে রত্না আর একবার ভাগীরথীর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, "স্বাগতাদি, আবার আসবো এখানে, কেমন। এ রূপ একবারে দেখা শেষ হয়না, বারে বারে দেখতে হয়।"

স্বাগতা চট্টোপাধ্যায় – কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাস্টার ডিগ্রি করে দীর্ঘদিন একটি বিদ্যালয়ের পরিচালনায় ছিলেন। ওনার নেশা হলো বই পড়া, দেশভ্রমণ আর ফটোগ্রাফি। লেখেননি কোনোদিন। অবসর নেবার পর খানিকটা শখে আর খানিকটা পরিচিত জনের অনুরোধে টুকটাক লেখালেখি। গঙোত্রী লেখিকার চার বার আর গোমুখ দুই বার ঘুরে আসা। গঙোত্রী যাত্রাপথের অভিজ্ঞতাই লেখিকা এখানে বলেছেন নিজের মতো করে।

অঞ্জন রায়

এ্যামাজনের জঙ্গলে ক'টা দিন

২০২২ সালের সেপ্টেম্বেরর শেষ সপ্তাহ । দক্ষিণ আমেরিকায় ইকুয়েডর-এ এ্যামাজন রেন ফরেষ্ট দেখবো বলে বেরিয়েছিলাম । শিকাগো থেকে হিউস্টন হয়ে রাজধানী কিতো (Quito) পৌঁছেছিলাম মাঝরাতে । কিতো নির্মিত হয়েছিল ১৬শ শতাব্দীতে, ইনকাদের তৈরি একটি শহরের ধ্বংসাবশেষ-এর ওপরে, যেটির উচ্চতা ৯৩৫০ ফুট । জন সংখ্যা ২ মিলিয়ন । চারদিক ঘিরে এড্রিয়ান পর্বতশ্রেণী । পরদিন ভোর ভোর বেরিয়ে পড়তে হল ১২০ মাইল দূরে তেনা নামক একটি জায়গার উদ্দেশে । তেনা (Tena) হল এ্যামাজন জঙ্গলে যাবার প্রবেশ পথ । যাবার পথে দেখবো 'বিষুব রেখা', অর্থাৎ 'Equator' । তাই কিতোকে বলা হয় Middle of the World City at the Equator in Ecuador । স্প্যানিশ ভাষায় Equator-কে বলে Ecuador ।

যথাসময়ে আমাদের বাস Middle of the World City তে- এসে পৌঁছুল। আদতে স্যান এন্টোনিও গ্রামটিকে খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে সেই জায়গাটির ওই নাম দেওয়া হয়েছে । দেখেই মনে হল এখানে পর্যটকদের যথেষ্ট আনাগোনা । একটি মনুমেন্ট তৈরি করা আছে । আর সিমেন্ট বাঁধানো জমিতে একটি লম্বা হলুদ দাগ কেটে কাল্পনিক বিষুবরেখাকে বাস্তবায়িত করে রাখা হয়েছে । কিতো থেকে এখানকার দূরত্ব ২৫ কিলোমিটার । অনেকের দেখাদেখি আমিও ওই হলুদ রেখার ওপর গিয়ে দাঁড়ালাম । আমার এক পা উত্তর গোলার্ধে, অর্থাৎ Northern Hemisphere-এ, আর আরেক পা দক্ষিণ গোলার্ধে, অর্থাৎ Southern Hemisphere-এ । এই জায়গাটির ভৌগলিক অবস্থান '0' ডিগ্রি অক্ষাংশ, অর্থাৎ '0' Degree Latitude । জানলাম, বিষুবরেখা ১৩টি দেশ, ৩টি মহাদেশ এবং ৩টি মহাসমুদ্রর ওপর দিয়ে গেছে । দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি হল ইকুয়েডর, কলোম্বিয়া এবং ব্রেজিল । ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে বিষুবরেখা যায়নি । ওটি গেছে ভারতের অনেক নিচ দিয়ে ।

এবার আমরা যাব সুদূর দক্ষিণে, এ্যামাজনের জঙ্গল দেখতে । পথে বায়েজা (Baeza) নামক একটি গ্রামে বাস দাঁড়ালো, লাঞ্চ খেতে । ওইটুকু গ্রামে 'জিনি' (Ginny) রেস্তোঁরাটি বেশ চমকপ্রদ । আমি খেলাম সুস্বাদু ট্রাউট মাছ, গ্রিল করা। বলা হলনা যে আমাদের ট্যুর ম্যানেজারের নাম নুকায়তো তিতোয়ানিয়া, তবে ওকে উইলসন নামে ডাকা হত । কে কি খাবে জেনে নিয়ে উইলসন আগেভাগেই ফোন করে খাবারের অর্ডার করে দিয়েছিল । লাঞ্চে আর খেয়েছিলাম ইকোয়েডোরিয়ন বিয়ার পিলসেনার (Pilsener) । পরে জেনেছিলাম যে উইলসনের বাবা বৃটিশ আর মা ইকোয়েডোরিয়ান । তবে ১৫ বছর পর্যন্ত ওঁকে ওঁর দাদুদিদিমার কাছেই মানুষ হতে হয়েছে । বাবাকে সে কোনদিন দেখেনি । আর, আমাদের বাস ড্রাইভারের নাম ছিল রোমিও । সারাটা পথ পাথরময় খরস্রোতা কুইগোস (Quigos) নদীর অববাহিকা ধরে ধরেই নিচে নামলাম । উইলসোন বললে যে ঐ নদীতে রিভার র‍্যাফটিং হয় । এ্যামাজনের জঙ্গল অবধি বাস যায়না । বাস যায় তেনা (Tena) পর্যন্ত, তারপর জলপথ । তেনার উচ্চতা ১৯৬২ ফুট । নিচেই ঘোলাজলের খরস্রোতা নদী রিও আরাহুনো (Rio Arajuno), মানে আরাহুনো নদীর অববাহিকাই এ্যামাজনের জঙ্গলে যাবার একমাত্র পথ । তেনার একটু আগে রাস্তার ধারে একটা দোকানের সামনে বাস দাঁড়ালো, উইলসনের নির্দেশে । বেশ বড় দোকান যেখানে শুধু কলাই পাওয়া যায় । উইলসন এককাঁদি কলা কিনে বাসের সামনের দিকে টাঙিয়ে রাখলো । উইলসন বললো ইকুয়েডর থেকে কলা এবং চিংড়ি মাছ বিদেশে রপ্তানী হয় । ইকুয়েডর-এ আর হয় প্রচুর কফি । উইলসন বললে ঐ কফি স্থানীয়ভাবেই বিক্রি হয় । ও আরো বললো যে এদেশের কফি বেশিটাই চলে যায় পাশের দেশ কলোম্বিয়ায় । আর সেই কফি কলোম্বিয়ান কফি নামেই বিশ্বের বাজারে বিক্রিত হচ্ছে !

তেনা পর্যন্তই বাস যায় । তারপরই নদী পথ । তেনা থেকেই মোটর চালিত ক্যানো (নৌকো) চেপে প্রায় আধ ঘন্টা

পথ পার হয়ে আমরা পৌঁছুলাম ইতামান্দি ইকো-লজ-এ (Itamandi Ecolodge)। ক্যানোগুলির ওপর চেয়ার পাতা, আর মাথার ওপর আছে ছাওনি। ইতামান্দি পৌঁছে বাঁধানো সিড়ি পথে ওপরে উঠেই লজ।

আমি আগে কখনো ইকোলজে থাকিনি। শুনেছি দেশেও নাকি এখন ইকোলজ হচ্ছে। দেশেরগুলো কেমন তা জানিনা, তবে ইতামান্দি ইকোলজ দেখা এবং এখানে থাকা আমার জীবনের এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা ! নদী থেকে ওপরে উঠেই লজ-এর শুরু। প্রথমে খোলামেলা লাউঞ্জ, ওপরটা ঢাকা, মাথার ওপর সব সোলার প্যানেল। ডানদিকে সুইমিং পুল। বাঁ দিকে 'বার'। পুল ছাড়িয়ে ডান দিকে রেস্তোঁরা। বসার ব্যবস্থা এক কথায় বিশ্বমানের। থাকার ঘরগুলো পিছনের দিকে। কাঠের পাটাতনের ওপর দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। প্রতিটি শোয়ার ঘরে আছে লাগোয়া বাথরুম। আর আছে একটি করে প্রাইভেট ব্যালকনি। ব্যালকনিতে দুটো চেয়ার আর একটি টেবিল পাতা। ব্যালকনির নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে আরাহুনো নদী। উল্টোদিকে ঘন সবুজ বন। লজ-এ আলোর ব্যবস্থা আছে, যা সোলার পাওয়ার-এ চলে। রেস্তোঁরার ডাইনিং রুম-লাগোয়া একটি পাওয়ার পোর্ট আছে, যেখানে সেল ফোনগুলি চার্জ করা যায়। ঘরে কোন প্লাগ পয়েন্ট নেই। উইলসন কলার কাঁদিটা লজ থেকে নদীর ঘাটে নামার মুখে টাঙিয়ে রেখেছিল। যাতে যার ইচ্ছে কাঁদি থেকে কলা ছিঁড়ে খেতে পারে। কলার সাইজ ছিল আমাদের দেশের চাঁপা কলার মত।

স্নান করে খেয়ে সেদিন তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। পরদিন সকাল সকাল উঠে এ্যামাজন জঙ্গলে যাব। ক্যানোয় চেপে মাইল দু'য়েক উজানে গিয়ে নামতে হল। নদীর দু'পাড়েই ঘন সবুজ জঙ্গল, আর 'দুই ধার উঁচু তার ঢালু তার পাড়ি'। লজ থেকে আমাদের দেওয়া হয়েছিল গামবুট এবং লাঠি। বলা হয়েছিল বন পথে চলতে কোথাও কোথাও কাদা হবে, আর লাঠিটা হল ব্যালেন্স রাখার জন্য। জঙ্গলে উঠে অল্প একটু এগিয়েই থামতে হল। সামনে দু'টো রক-ওয়াল। ওপরের দিকটা mud, অর্থাৎ কাদার দেয়াল। আমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। এখানে টিয়া পাখি দল বেঁধে আসবে কাদার দেয়াল থেকে ঠুকে ঠুকে মিনারেল খেতে। ওরা রোজ আসে। এই সকালের দিকে। এখানে এটাই নিয়ম। আমরা গাছগাছালির নিচে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ওরা এলো, এক এক করে, সশব্দে। প্রথমে আশপাশের বড় বড় গাছের ডালে এসে বসলো। কিছুক্ষণ ওড়াওড়ি। পর্যবেক্ষণ। বাজপাখি নেইতো ? যখন নিরাপদ মনে হল তখন এক এক করে টিয়াগুলো নেমে এলো কাদার দেয়ালের ওপর। জানলাম দু'রকম প্রজাতির টিয়া আছে এখানে। প্রকৃতির এ এক বিস্ময়কর খেলা !

কিছুক্ষণ টিয়া পর্যবেক্ষণ করে আমরা লজে ফিরে এলাম। ব্রেকফাস্ট সেরে আবার ক্যানোয় চাপা। আবার আরাহুনো নদীর উজানে। অনেকটা পথ পেরিয়ে এবার জঙ্গলে ঘোরা। উইলসন বললে বন এবং বন্যপ্রাণী রক্ষার্থে ইকোয়েডোরিয়ান এ্যামাজনের পর্যটকদের জন্য শুধু একটি নির্দিষ্ট এলাকাতেই ঘোরানো হয়। এই সংরক্ষিত এলাকাটির নাম য়োকোতোপো (Jocotopo)। আমাদের দলে ২৩ জন সদস্য। আমরা দু'ভাগে ভাগ হয়ে বনপথে হাঁটতে বেরুলাম। উইলসন ছাড়াও আমাদের সঙ্গে আরেকজন ছিলেন স্থানীয় গাইড। লোকটি অত্যন্ত দক্ষ, কিন্তু শুধু স্প্যানিশভাষী। ইংরাজির বিন্দুবিসর্গও বোঝেনা। যাইহোক, আমি আমার জন্মস্থান উত্তর বাংলার জয়ন্তীতে রেন ফরেষ্ট দেখেছি। যা ছিল আমাদের বাড়ির পিছন দিক থেকে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত। কিন্তু গরুর গাড়ি চলার রাস্তা, ট্রাক চলাচলের রাস্তা, বেআইনি গাছ কাটা, ইত্যাদি কারণে সেই জঙ্গল ছিল অনেকটাই ফিকে। তবে মাইল দশেক দক্ষিণে পানবাড়ি বিট-এ আমি একবার গিয়েছিলাম।

তখন ডুয়ার্সের রেন ফরেষ্ট-এর নমুনা দেখেছিলাম, সে বহু বছর আগে । কিন্তু আজ ইকুয়েডরে, এ্যামাজনের রেন ফরেস্ট-এর মাঝে অন্যরকম অনুভূতি হল । বিরাট বিরাট গাছ, মনে হল যে একে অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে । সরু পায়ে চলা পথ, প্রায়শই কাদা জল । সাবধানে হাঁটছি । অন্যমনস্ক হলেই হুমড়ি খেয়ে পড়ার সম্ভাবনা । কেননা গাছ গুলির শেকড়বাকর চারদিকে ছড়ানো । তারই মাঝে গাইড আমাদের নানারকমের পোকা, মাকড়, গাছ-গাছালি চেনাতে লাগলো । দেখলাম কতরকমের প্রজাপতি, বিষাক্ত ব্যাঙ, ইত্যাদি । জাগুয়ার, পুমা, বিশালাকার ভোঁদর, পিপিলিকাভূক ইত্যাদি প্রাণী অধ্যুষিত বনাঞ্চলকে আমরা এড়িয়ে গিয়েছিলাম । গাইড গাছের পাতা বুনে বুনে মাথার মুকুট বানালো, ফ্যান তৈরি করে একজনকে ঝাড়ফুঁক করল । প্রায় ঘন্টা দুয়েক জঙ্গলে ঘুরে এক পেট ক্ষিদে নিয়ে লজ-এ ফিরে এলাম । বিকালে আবার বেরুলাম । খরস্রোতা আরাহুনো নদীতে টিউবে ভেসে ভেসে প্রায় দু'মাইল পরিক্রমণ । ওপরে নদীর জলে ভাসা, আর নিচে রয়েছে কুখ্যাত পিরাহনা মাছ । সুদক্ষ গাইডের তত্বাবধানে ঘন জঙ্গলের মাঝে নদীর ওপর টিউব-এ ভেসে চলা সে এক অনন্যসাধারণ অভিজ্ঞতা । রাত্রে আবার বনপথে টর্চ হাতে হাঁটার কর্মসূচি ছিল, কিন্তু আমরা আর যাইনি ।

পরদিন ব্রেক ফাস্ট সেরে আবার আরাহুনো নদীর উজানে কুয়েচা সম্প্রদায়ের (Quecha Community) গ্রামে কিছুক্ষণ কাটানো । কুয়েচাদের গ্রামে খড়ের তৈরি বেশ বড় একটা মাটির ঘরে এলাম, চারি দিকে বেঞ্চপাতা । প্রথমে আমাদের 'চা' খেতে দেওয়া হল । আমি চা খাইনা । ভাস্বতী চা-এ এক চুমুক দিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে আরেকটু দিতে বললো । নারকেলের মালাই-এর মত পাত্রে চা দেওয়া হচ্ছিল । কুয়েচা মহিলা খানিকটা ইতস্ততঃ করে আরো খানিকটা চা ঢেলে দিল । পরে শুনেছিলাম যে ঐ চায়ে কোকেন মেশানো ছিল ! এরপর দেখলাম জঙ্গলের শেকড়বাকর দিয়ে ওরা কেমন খাবার তৈরি করে তার কিছু নমুনা । এরপর কুয়েচা ছেলেমেয়েরা সাবেকি পোষাকে দলগত নাচ দেখালো, মিউজিক বাজলো ক্যাসেট প্লেয়ারে । তারপর গেলাম পাশের ছাউনিতে, যেখানে সুন্দরভাবে সাজানো ছিল ওদের হস্তশিল্পের কিছু নিদর্শন । আমাদের অনেকেই কিছু কিছু জিনিস কিনলো । এরপর আমরা ফিরে এলাম লজ-এ । কুয়েচাদের সঙ্গে আমি উত্তর বাঙলার রাভাদের আশ্চর্য রকম মিল দেখেছিলাম !

লাঞ্চ খেয়ে ক্যানোয় চেপে তেনায় ফিরে মারিওর বাসে চেপে পাপায়েক্টার (Papallacta, 10,837 ফুট) পথে এ্যানাকোন্ডা দেখা । সাপটি রাস্তার ধারে ছিল । উইলসন ওটাকে দেখতে পেয়ে বাস থেকে নেমে গিয়ে খুব দক্ষতার সঙ্গে মাথার কাছটি চেপে ধরে, তারপর ধরে শরীরের একটা অংশ । পর্যটকদের অনেকেই এ্যনাকোন্ডার সঙ্গে ছবি তুলতে নেমে ভীড় করে দাঁড়ায় । পাপায়েক্টায় Termas de Papallacta একটি আশ্চর্য সুন্দর ইকোলজ । এটিও সোলার পাওয়ারে চলে । লজ-এর উঠোনে একটা হট স্প্রিং আর পিছনে একটি মাথা উঁচু করা পাহাড় শ্রেণী । অনেক বছর আগে মানালিতে আমি হট স্প্রিং-এ স্নান করেছিলাম । এখানেও গরম জলে নেমে পড়লাম । প্রায় ১১ হাজার ফুট উঁচুতে ঠান্ডা আবহাওয়ায় । সারাদিনের ক্লান্তি যেন জুড়িয়ে গেল ।

পাপায়েক্টা থেকে কিতো ঘন্টা খানেকের রাস্তা, ঢালু পথ । লজ-এর খুব সুন্দর একটা রেস্তোঁরায় সকলের সঙ্গে ডিনার সেরে গভীর রাতে হিউস্টন হয়ে শিকাগোর প্লেন ধরবো বলে আমরা আবার কিতো এয়ারপোর্ট-এ এসে পৌঁছুলাম ।

# # #

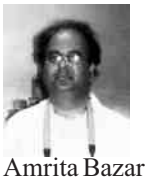

Anjan Roy — Anjan is a Freelancing Journalist writing in different Bengali Journals and Magazines in the US and abroad. He lives in Willowbrook, Illinois. Recipient of Mother Teresa Fellowship. He did master's degree of social work from Washington University Saint Louis, Missouri, USA. He was an eminent Journalist in Kolkata worked with Ananada Bazar Patrika, All India Radio and Calcutta Television and many others. Wrote articles and news-stories for Ananda Bazar Patrika, Desh, Hindusthan Standard, Amrita Bazar Patrika, Jugantar, Amrita, Paribartan and many other Calcutta-based newspapers and magazines.

বাতায়ন থেকে প্রকাশিত

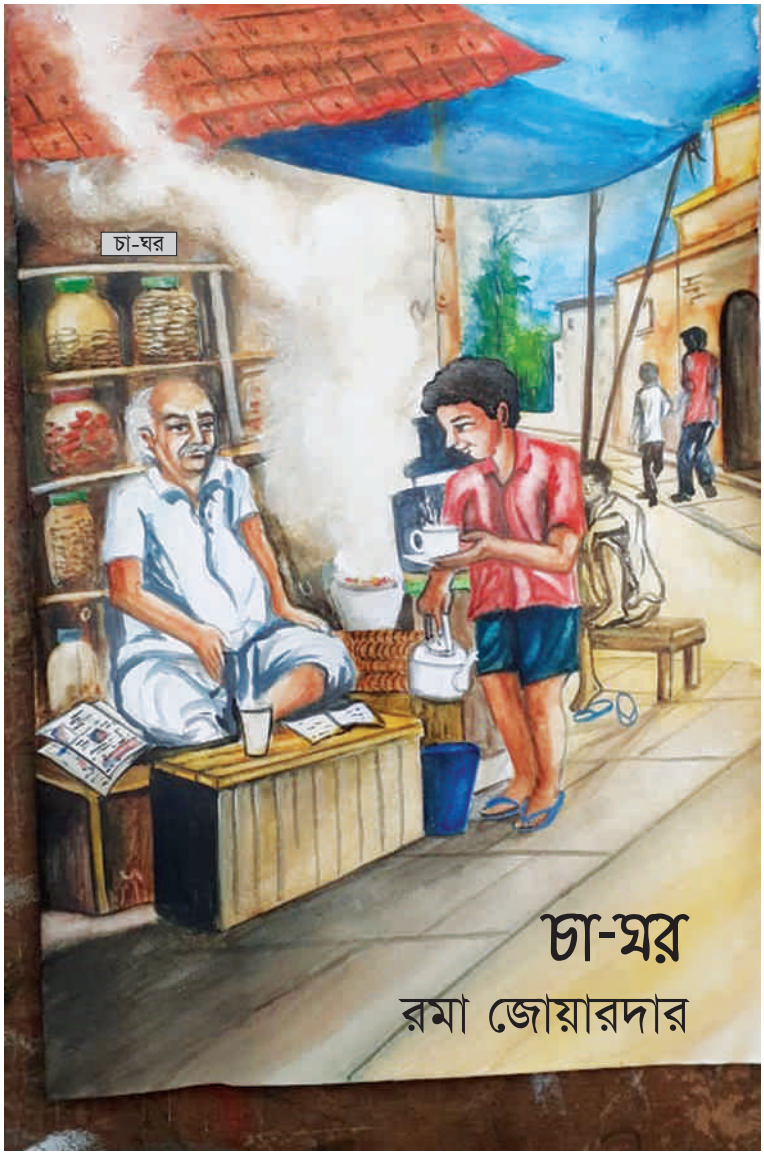

রমা জোয়ারদার গত পঁচিশ বছর ধরে ছোটগল্প, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদি সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে নানা-রকমের লেখা লিখে চলেছেন। চা-ঘর তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস ।

রমা জোয়ারদার, প্রয়োজনে এবং শখে দেশের গ্রামে গঞ্জে অথবা বিদেশে অনেক ঘুরে বেড়িয়েছেন। সেসব বেড়ানোর টুকরো ছবি তাঁর লেখায় অনেক জায়গায় উঠে এসেছে।

দক্ষিণীবার্তা, উন্মুক্ত উচ্ছ্বাস, মাতৃমন্দির সংবাদ, সাহিত্য তীর্থ, প্রতীচী, অমৃতলোক, বাতায়ন কথাসাহিত্য, প্রসাদ ইত্যাদি বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। নবনীতা বসু-হকের সম্পাদনায় "ভারতীয় সেরা লেখিকাদের সেরা গল্প"-এ তাঁর গল্প সংকলিত হয়েছে। তাঁর লেখা "খিড়কি দরজা"-র ইংরেজি নাট্যরূপ "দি ব্যাকডোর", আর্লিংটন সেন্টার অব আর্টস, ম্যাসাচুসেটস-এ অভিনীত হয়েছে।

মুদ্রিত গল্প সংকলন:

রোজনামচার ছেঁড়াপাতা
সবুজ ঢেউ আর ঝাপসা চাঁদ
বৃত্তের বাইরে পাঞ্চালী
ওরা কথা বলে (যন্ত্রস্থ)

সুজয় দত্ত বর্তমানে আমেরিকার ওহায়ো রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানতত্ত্বের (statistics) অধ্যাপক। জৈবপরিসংখ্যান বিশ্লেষণতত্ত্ব (biostatistics) তাঁর গবেষণার বিষয়। তিনি কলকাতার বরানগরের ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন ছাত্র। কিন্তু তরুণ বয়স থেকেই সাহিত্য তাঁর সৃজনশীলতার মূল প্রকাশমাধ্যম, তাঁর মনের আরাম। ছোটগল্প, বড় গল্প, প্রবন্ধ ও রম্যরচনার পাশাপাশি নিয়মিত কবিতাও লেখেন। এছাড়া করেছেন বহু অনুবাদ – হিন্দি থেকে বাংলায় এবং বাংলা থেকে ইংরেজিতে। গত কুড়ি বছরে আমেরিকার বেশ কয়েকটি সাহিত্য-পত্রিকায় ও পুজাসংখ্যায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি দীর্ঘদিন হিউস্টনের "প্রবাস বন্ধু" ও সিনসিনাটির "দুকুল" পত্রিকার সম্পাদনা ও সহসম্পাদনার কাজও করেছেন। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার "বাতায়ন" পত্রিকাটির জন্মলগ্ন থেকে সেটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছেন। এই তিনটি পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলি ছাড়াও "অপার বাংলা" ও "গল্পপাঠ" নামক ওয়েব-ম্যাগাজিন দুটিতে, নিউজার্সির "আনন্দ-লিপি" নামক পত্রিকাটিতে ও "অভিব্যক্তি" নামক ওয়েব-ম্যাগাজিনে, ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত পূজাসংকলন "মা তোর মুখের বাণী"তে, কানাডার অন্টারিও থেকে প্রকাশিত "ধাবমান" পত্রিকায়, ভারতের বিশাখাপত্তনম থেকে প্রকাশিত বৈদ্যুতিন পত্রিকা "কুলায়ফেরা" এবং মুম্বাই থেকে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ "কবিতা পরবাসে" রয়েছে তাঁর লেখা। সম্প্রতি নিউ জার্সির "আনন্দ মন্দির" তাঁকে "গায়ত্রী গামার্স স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কারে" সম্মানিত করেছে। সাহিত্যরচনা ছাড়া অন্যান্য নেশা বই পড়া, দেশবিদেশের যন্ত্রসঙ্গীত শোনা ও কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র বাজানো।

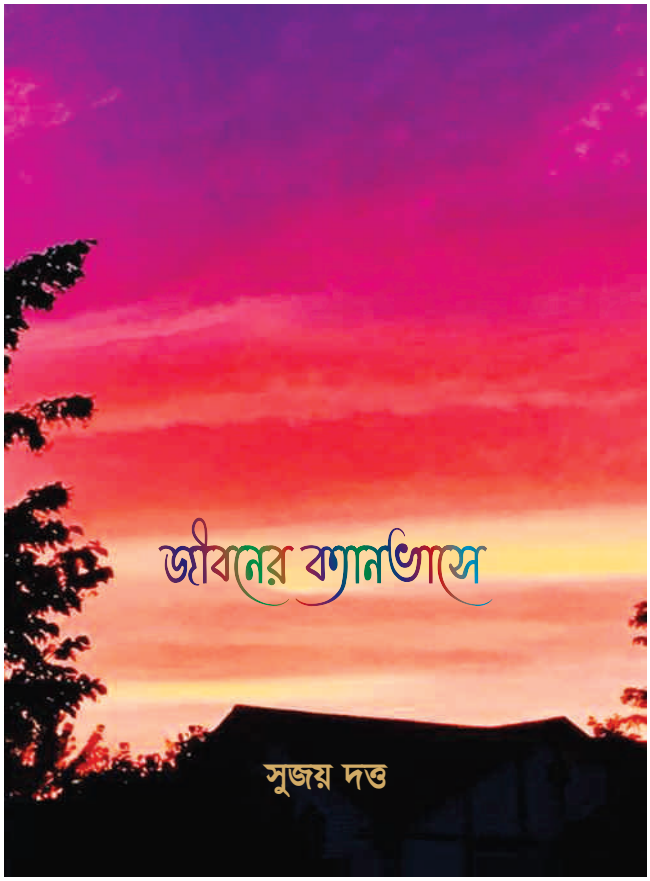

১৯৭৩-এর ১৪ জানুয়ারী কলকাতায় জন্ম সঞ্জয়ের। বাবা ছিলেন প্রাক্তন সরকারি কর্মচারি এবং মা পুরোদস্তুর সংসার সামলে এসেছেন। কলকাতার উপকণ্ঠে উত্তরপাড়া, হিন্দমোটর অঞ্চলে প্রাথমিক জীবন ও স্কুল শেষ করে পরবর্তী কালে উচ্চশিক্ষার্থে জলপাইগুড়ী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে চলে যান এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক হন ১৯৯৬ সালে। কর্মসুত্রে তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস ও অভিজ্ঞতা অর্জনের পর ২০০৬ থেকে বিদেশে কর্মরত। বর্তমানে সস্ত্রীক অষ্ট্রেলিয়ার সিডনী শহর তাদের পাকাপাকি আস্তানা। নেশা বলতে বাগান করা আর ফটোগ্রাফি। কবিতার প্রতি সঞ্জয়ের ভালোবাসা ও লেখালেখি অনেকদিনের, বাতায়ন সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লিখছেন।

গানের জগতেও গীতিকার হিসেবে সঞ্জয়ের বিচরণ অনেক দিনের। তার লিরিক্সে সুর দিয়ে গান করেছেন অনেক গুণী শিল্পী।

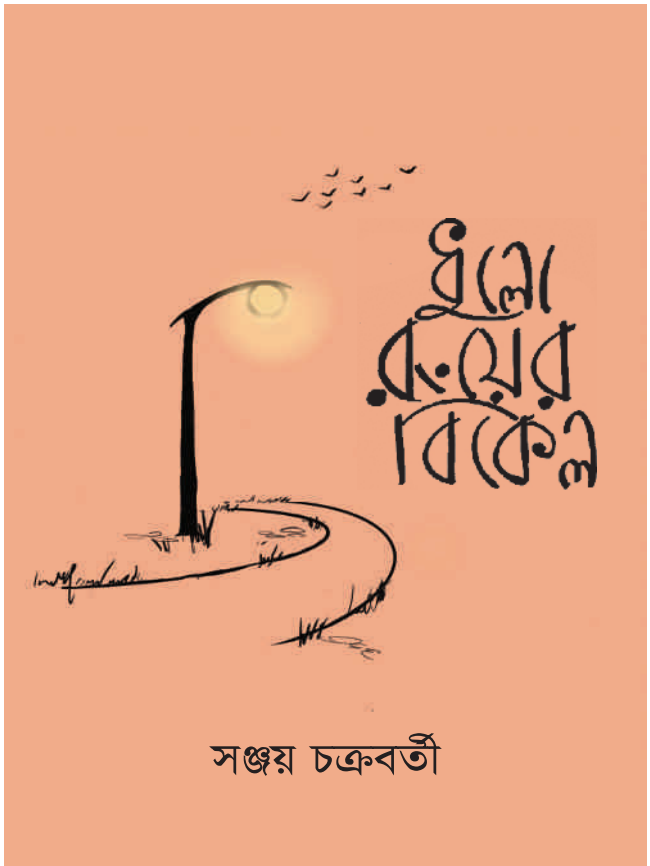

SHABDAKALPA

This digital historical dictionary documents the evolution of the Bengali language over time, providing valuable insights into its linguistic development. It provides a comprehensive history of individual words, contributing to the total history of the language.

- a dictionary for all texts and levels
- a comprehensive online teaching and study aid
- a reference tool for editors of Bengali texts of all periods
- the final authority on all points of spelling and usage
- an encyclopedia of unique granularity for all Bengali life and culture

- Records the first occurrence of a word
- Records the first occurrence of every new meaning
- Groups these meanings by semantic evolution
- Records all major changes of form
- Documents every example with source and quotation
- Records the etymology
- Annotates significant points of meaning and usage

A project undertaken by the School of Cultural Texts and Records, Jadavpur University.

শব্দকল্প

বাংলা ভাষার বৈদ্যুতিন বিবর্তনমূলক অভিধান

এই পরিপূর্ণ অভিধানটির ব্যবহার নানান ক্ষেত্রে হতে পারে।

- শিক্ষাক্ষেত্রে
- গবেষণায়
- পরিভাষার ব্যবহারে
- সাহিত্যপাঠে
- সম্পাদনা ও মুদ্রণে
- ভাষাচর্চায়

বাংলা ভাষার ইতিহাস | বাংলা সাহিত্যসঙ্গী | বাংলার ব্যুৎপত্তি | বাংলা ভাষার প্রয়োগ

বাংলার জীবন, ইতিহাস ও সংস্কৃতির সবরকম তথ্যের সম্পূর্ণ কোষ।

ভাষাজ্ঞান আর ভাসা ভাসা নয়!

শব্দকল্প কী?

শব্দকল্প একটি নির্মীয়মান বাংলা ভাষার ইতিহাসভিত্তিক বা বিবর্তনমূলক অভিধান (historical dictionary)। এটি তৈরি করছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অভ কালচারাল টেক্সটস অ্যাণ্ড রেকর্ডস।

এমন অভিধানের বৈশিষ্ট্য কী?

ইতিহাসভিত্তিক অভিধানের লক্ষ্য, কোনও ভাষার গোটা শব্দভাণ্ডার জড় করে প্রতিটি শব্দের ইতিহাস তুলে ধরা: শব্দটি কবে প্রথম ব্যবহার হয়েছে, তারপর সেটির রূপ, অর্থ ও প্রয়োগ কখন কীভাবে বদলেছে। এক কথায়, এটি কোনও ভাষার সম্পূর্ণ ও অনুপুঙ্খ ইতিহাস।

বাংলার শব্দকোষ

বাংলার বিবর্তন

বাংলার সংস্কৃতি

Facebook link: https://www.facebook.com/GJUAF
LinkedIn link: https://www.linkedin.com/company/73444983/
YouTube Link: https://www.youtube.com/@GJUAF